নিউইয়র্কের নীল আকাশে ঝকঝকে রোদ

হুমায়ূন আহমেদ

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

হুমায়ূন আহমেদ

পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি কবিতার শিরোনাম—'ক্রেমলিনের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ'। আমি যেখানে আছি, সেই রেস্টহাউসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতার লাইন মনে এল। ঝকঝক করছে রোদ। আকাশ ঘন নীল। জানালার পাশে অচেনা এক বৃক্ষের পাতায়ও রোদের রং লেগেছে। রোদ আমাকে কখনো অভিভূত করে না, আমি বৃষ্টিরাশির জাতক, কিন্তু আজ আকর্ষণ করল। আমি অভিভূত গলায় উচ্চারণ করলাম, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ!

আমি ঘরে একা। পাশের ঘরে এস আই টুটুল বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে গিটার। সে ঘোষণা করেছে, আজ সারা রাত সে আমার লেখা গান গেয়ে শোনাবে। আমি বললাম, কেন?

সে বলল, আপনাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য।

আমি বললাম, গান ছাড়াই ভালো আছি। আমাকে একা থাকতে দিলেই অনেক আনন্দে থাকব।

টুটুল গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ডলার কামাচ্ছে। সব অনুষ্ঠানের শেষের গান নাকি হুমায়ূন আহমেদের লেখা 'চান্দিপসর রাইতে যেন আমার মরণ হয়'। সংগত কারণেই এই গানের পর শ্রোতারা খানিকটা বিচলিত হন। শ্রোতাদের এই বিচলিত অবস্থা টুটুল উপভোগ করে। আমি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরলে টুটুল মনে হয় খানিকটা বেকায়দা অবস্থায় পড়বে। সে সবাইকে ধারণা দিয়ে দিয়েছে, নিউইয়র্কযাত্রা আমার অগস্ত্যযাত্রা।

আমার স্বভাব হচ্ছে, যেকোনো অবস্থায় যেকোনো বিষয় নিয়ে রসিকতা করা। মৃত্যু নিয়ে ক্রমাগত রসিকতা করে যাচ্ছি। এই রসিকতা কেউ সহজভাবে নিতে পারছে না।

রসিকতার নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আমাকে বিদায় জানানোর জন্য সবাই উপস্থিত হয়েছে। চেহারা করুণ করার আপ্রাণ চেষ্টা সবার। একপর্যায়ে আমি বললাম, ভালো খাবারের ব্যবস্থা আছে, সবাই খেয়ে যাবেন। এটা আমার কুলখানির খাবার। নিজের কুলখানির খাবার নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়ানো একটা ভাগ্যের ব্যাপার। আমি ভাগ্যবান। ক্যামেরাম্যান মাহফুজুর রহমান খান বিদায় জানাতে এসেছেন। তাঁকে বললাম, আপনার মৃত বাবার কাছে কোনো খবর পৌঁছাতে হলে আমাকে দিতে পারেন। আমি খবর দিয়ে দেব।

নিউইয়র্কে পৌঁছালাম বিকেলে। এম্বেসি থেকে আমাকে রিসিভ করতে এসেছে দেখে চমকালাম। 'এম্বেসি মণিহার' আমার নাহি সাজে। মুক্তধারার বিশ্বজিৎ গাড়ি নিয়ে এসেছে। নুহাশের মায়ের

মামাতো বোন (জলি) থাকেন নিউইয়র্কে; তিনিও গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আমি পড়লাম মহাবিপদে। কোন গাড়িতে চড়ব? এম্বেসি? বিশ্বজিৎ, না জলি?

আমার চিকিৎসা শুরু হবে মেমোরিয়েল স্লোয়ান কেটারিং ক্যানসার সেন্টারে। এটি নাকি পৃথিবীর এক নম্বর ক্যানসার গবেষণা ও চিকিৎসাকেন্দ্র। স্লোয়ান ও কেটারিং নামের দুই ইঞ্জিনিয়ার তাঁদের জীবনের সব সঞ্চয় দান করে এই হাসপাতাল তৈরি করেছেন। পৃথিবীর ক্যানসার রোগীদের নজর এই হাসপাতালের দিকে বলেই তিন-চার সপ্তাহের আগে ডাক্তারের কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াই সম্ভব না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, নিউইয়র্কে যেদিন পৌঁছালাম তার পরদিনই ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেল। ব্যবস্থা করলেন গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের স্ত্রী পূরবী দত্ত। তিনি নিজেও গল্পকার; একসময় এই ক্যানসার সেন্টারে গবেষক হিসেবে কাজ করতেন। কেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতালে আমার মতো অভাজনের চিকিৎসা হওয়া উচিত, তা তিনি তাদের লিখে জানালেন। পূরবী দত্ত এতটা মমতা আমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা আমার জানা ছিল না। ‘অকৃতী অধম জেনেও তো তুমি কম করে কিছু দাওনি।’

আমার ডাক্তারের নাম স্টিফান আর ভেচ। দীর্ঘদেহী সুস্বাস্থ্যের বয়স্ক একজন মানুষ। খানিকটা গম্ভীর। ভুরু কুঁচকানো। তিনি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের সব কাগজপত্র পরীক্ষা করলেন। ওই হাসপাতাল থেকে মূল স্লাইড তলব করলেন। আমি একসময় বললাম, আমার

ক্যানসার কোন পর্যায়ের? ডাক্তার বলেন, চতুর্থ পর্যায়ের। ক্যানসার যখন মূল কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমরা তাকে বলি চতুর্থ পর্যায়ের ক্যানসার।

আমি ভীত গলায় বললাম, ডাক্তার, আমি কি মারা যাচ্ছি?

ডাক্তার ভেচ নির্বিকার গলায় বললেন, হ্যাঁ।

শাওনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

মারা গেলে করার তো কিছু নেই। কে সারা সারা!

ডাক্তার ভেচ হঠাৎই আমার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুমি একা তো মারা যাচ্ছ না। আমরা সবাই মারা যাচ্ছি। এই কারণে বললাম তুমি মারা যাচ্ছ। তবে খুব দ্রুত যে মারা যাবে, সে রকম মনে হচ্ছে না।

রোগের বাইরে ডাক্তারের সঙ্গে অনেক কথা হলো। ডাক্তার বললেন, তুমি পেশা কেন বদলেছ? ছিলে কেমিস্ট, হয়েছ লেখক।

আমি বললাম, পৃথিবীতে অনেক কেমিস্ট আছে, সে তুলনায় লেখক কম বলেই পেশা বদলেছি। আমার ছেলেও কেমিস্ট। তার কেমিস্ট্রিতে তোমার মতো পিএইচডি ডিগ্রি আছে। লেখালেখির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার কোনো বই কি ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে?

আমি বললাম, হয়েছে। তবে তোমার জন্য আমি আমার নিজের ভাষা বাংলায় লেখা বই নিয়ে এসেছি। এই বইয়ে কী লেখা তুমি কিছুই বুঝবে না। তবে তুমি যদি বইটা তোমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রাখো, তাহলে আমার ভালো লাগবে। বইটার দিকে চোখ পড়লেই তোমার মনে হবে, অতি দূরদেশের বাংলা ভাষার এক লেখককে তুমি চিকিৎসা দিয়েছিলে।

ডাক্তার ভেচের হাতে বাদশাহ নামদার উপন্যাস তুলে দিলাম। তিনি বই হাতে নিয়ে বললেন, এই বই আমি আনন্দের সঙ্গে আমার লাইব্রেরিতে রেখে দেব।

শাওন একটু পরপর কেঁদে উঠছিল। ডাক্তার একসময় শাওনের পিঠে হাত রাখলেন। ভরসার এই স্পর্শ শাওনের জন্য প্রয়োজন ছিল।

পাদটীকা

একটা আলাদা স্যুটকেস ভর্তি করে আমি লেখালেখির প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসেছি। কাগজ, কলম, কাঁচি, গাম, ডিকশনারি এবং বেশ কিছু রেফারেন্স বই।

পুত্র নিষাদকে পাশে নিয়ে স্যুটকেস খুললাম। আমাদের দুজনকে চমকে দিয়ে স্যুটকেস থেকে একটা তেলাপোকা বের হলো। অসম্ভব প্রাণশক্তির এই পোকা বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। তেলাপোকাটা আমার দিকে সামান্য এগিয়ে মেঝেতে পড়ে

গেল। তার পাগুলো শূন্যে, পাখা মেঝেতে। কিছুক্ষণ পা নেড়ে সে স্থির হয়ে গেল। দীর্ঘ ভ্রমণ চমৎকারভাবে শেষ করে সে মৃত। আমি নিষাদকে বললাম, বাবা, দেখো, বেচারা মারা গেছে। নিষাদ বলল, তেলাপোকাকে বেচারা বলতে হয় না। মানুষকে বেচারা বলতে হয়। তুমি যখন মারা যাবে, তখন বলবে বেচারা।

তেলাপোকার মৃত্যু এবং পুত্রের কথায় প্রতীকী কিছু কি আছে?

আইনস্টাইন, আপ সাইড ডাউন

হুমায়ূন আহমেদ

হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবসাপাতি খারাপ হলে, গণেশ মূর্তি উল্টে দেওয়ার নিয়ম আছে। ১০ অক্টোবরে টাইম পত্রিকায় দেখলাম আইনস্টাইনের ছবি উল্টো করে ছাপা হয়েছে। কারণ আইনস্টাইনের মূল তত্ত্বই ভুল, এরকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আইনস্টাইনের তত্ত্বের মূল স্তম্ভ_ 'আলোর গতি ধ্রুবক'।

ইউরোপের একদল পদার্থবিদ একগুচ্ছ নিউট্রিনোর দেখা পেয়েছেন যাদের গতিবেগ আলোর চেয়ে সামান্য বেশি। ঘটনা সত্যি হলে পদার্থবিদ্যার প্রতিটি টেক্সট বই নতুন করে লিখতে হবে। ফিজিক্স ভয়ঙ্কর।

নিউট্রিনোর গতি কতটা বেশি পাওয়া গেছে সেই হিসাব টাইম পত্রিকা সুন্দর করে দিয়েছে।

পৃথিবী থেকে দৌড়ে উসিয়ান বোল্ট (ম্যারাথন বিজয়ী) যদি চাঁদে যেতে চান তাহলে তার লাগবে ৩৬৫ দিন।

বোয়িং ৭৪৭-এর লাগবে আট দিন।

অ্যাপোলো ১১ রকেটের লাগবে ৭৩ ঘণ্টা।

আলো সময় নেবে ১.২৮৩০ সেকেন্ড।

নিউট্রিনো নেবে ১.২৮২৯ সেকেন্ড।

আইনস্টাইন ভুল প্রমাণিত হচ্ছেন, এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা উল্লসিত_ তা কিন্তু না। যারা আবিষ্কারটা করেছেন তারাও চিন্তিত। আলোর চেয়ে বেশি গতি মানে সময়ের উল্টোদিকে চলা। এতে আদি সত্য Caus এবং Effect ভেঙে পড়া। বন্দুকের ট্রিগার টেপার আগেই গুলি বের হয়ে যাওয়া।

অতীতে অনেকবার আইনস্টাইনের তত্ত্ব ভুল প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এবারও সম্ভব হবে না।

এই গ্রহের সবচেয়ে মেধাবী মানুষ আইনস্টাইন। তাঁর মস্তিষ্ক গবেষণার জন্যে সংরক্ষিত।

পাঠকরা শুনলে মজা পাবেন যে,

লেখকদের

একজনের মস্তিষ্কও কিন্তু গবেষণার জন্যে সংরক্ষিত আছে। লেখকের নাম ম্যাক্সিম গোর্কি। এই লেখকের ব্রেইন সংরক্ষিত আছে মস্কোর ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজির একটি জারে। মস্তিষ্কের ওজন ১৪২০ গ্রাম। মস্তিষ্কের 'জিনিয়াস' বিষয়টি পরীক্ষা করে ধরার চেষ্টা করা হলো। কিছু পাওয়া গেল না।

আইনস্টাইনের ব্রেইন পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া যায়নি। একজন সাধারণ আমজনতার ব্রেইনের চেয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি বা আইনস্টাইনের ব্রেইন আলাদা কিছু না।

আমরা কি এখন 'থাক বাঁচলাম' বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি? না, পারি না। আমজনতা থেকে কিছু মানুষ সবসময়ই আলাদা হয়ে যাবে। আলাদা তারা কীভাবে হয়, কেন হয়, এই তথ্য কারোরই জানা নেই। আমি সবসময় আলাদা মানুষ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। যদি কোনো রহস্য পাওয়া যায় কেন তারা আলাদা। কীভাবে?

যারা সুপার জিনিয়াস পরিচিতি পেয়ে যান তাদের ধারে-কাছে যাওয়া কঠিন ব্যাপার। পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং এমন একজন। আমি এই মহান পদার্থবিদের সঙ্গে কথা বলতে খুবই আগ্রহী শুনে আমার বন্ধু বলল, কোনো সমস্যা নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। তোমাকে আমার সঙ্গে লন্ডনে যেতে হবে। লন্ডনে আমার যে রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে স্টিফেন হকিং বাংলা ফুড খেতে আসেন। আমাকে চেনেন এবং খুবই পছন্দ করেন।

আমি বললাম, চুপ থাক ব্যাটা!

সে আহত গলায় বলল, আমি ছবি দেখাচ্ছি। বলেই দুনিয়ার ছবি বের করল। স্টিফেন হকিং বাংলা খাবার খাচ্ছেন। আমার বন্ধুর হাত ধরে আছেন_ এইসব।

স্টিফেন হকিংয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা শেষ, কারণ আমার বন্ধু মারা গেছেন। আমার বন্ধুর নাম মাহবুব মোল্লা।

সব মানুষের মতো আমার কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। হঠাৎ হঠাৎ কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করার প্রবল বাসনা তৈরি হয়। এই বাসনা যাদের জন্যে তৈরি হয় তারা সবাই মৃত। যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ, সতীনাথ ভাদুরি।

গত কিছুদিন ধরে স্টিভ জবস নামের কিংবদন্তি মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। অঢ়ঢ়ষব গুরু, কর্মবীর এবং অতি মেধাবী একজন মানুষ মারা গেছেন ক্যান্সারে। তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, আমেরিকায়ও চিকিৎসার অভাব ছিল না।

স্টিভ জবসের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি তার সন্তানদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, তাদের দিকে ফিরে তাকানো হয়নি।

তিনি বলছেন, এক অর্থে ক্যান্সার আমার জন্যে শুভ হয়ে এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার সময় শেষ। আমি আমার সর্ব মেধা ব্যয় করেছি হাতের কাজ গুটিয়ে আনতে।

মৃত্যুর আগে আগে স্টিভ জবস লিখলেন, "I like to think that something survives after you die. It is strange to think that you accumulate all this experience and may be a little wisdom, and it just goes away. So I really want to believe that something survives."

আমি আমার ডাক্তার স্টিফেন আর ভিচকে বললাম, তোমরা থাকতে, স্লোয়ান-কেটারিং থাকতে, স্টিভ জবস কেন মারা গেলেন?

ডাক্তার ভিচ বললেন, স্টিভ জবস স্লোয়ান-কেটারিংয়ে চিকিৎসা নেননি। দুর্দান্ত মুডি মানুষ হিসেবে শুরুতেও চিকিৎসা নেননি। অপারেশনে রাজি হননি। যখন রাজি হলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনকলজিস্টরা অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্টে গেছেন। তার পুরো লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে। অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট সবসময় শুভ ফল আনে না।

ক্যান্সার বিষয়ে আমি এখন অনেক কিছু জানছি। লাং ক্যান্সারকে এখানে ভয়াবহ বলা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্ট্যাটিসটিক্স বলছে, ৬০% লাং ক্যান্সারের রোগী কখনোই সিগারেট খায়নি। তবে বাকি ৪০% ভাগের সবাই ধূমপায়ী।

ক্যান্সারে মৃত ৯৯% রোগী হলো মহিলা, ১% পুরুষ।

মহিলাদের প্রায় সবাই মারা যায় ব্রেস্ট ক্যান্সারে। আমাদের দেশের মেয়েদের এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। অনেককে দেখা যায় 'স্তন' শব্দটি যুক্ত থাকার কারণে লজ্জা বোধ করেন। রোগের কাছে লজ্জার কিছু নেই। রোগ লুকানোতেই লজ্জা।

পাদটীকা

শারীরিক ক্যান্সারের মতো মানসিক ক্যান্সারও কিন্তু আছে। রাজনীতিবিদরা দ্রুত এই রোগে আক্রান্ত হন। তখন তারা ডিলিউশনের সমুদ্রে ডুবে যান, ভাবতে থাকেন বাংলাদেশটা শুধুই তাদের ভোগের জন্যে। ক্ষমতা চলে গেলে ডিলিউশন কেটে যায়। ক্যান্সার কিন্তু সারে না। ক্যান্সার অপেক্ষা করে পরবর্তী ডিলিউশনের জন্যে।

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

কচ্ছপকাহিনি

হুমায়ূন আহমেদ

প্রায় ১০০ বছর আগে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক গ্রামের দৃশ্যচিত্র। আসরের নামাজ শেষ করে মাদ্রাসার একজন হতদরিদ্র শিক্ষক তাঁর বড় দুই পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। তাদের বললেন, আমি হতদরিদ্র, নাদান একজন মানুষ। তোমাদের দুজনকে পড়াশোনা করানোর সাধ্য আমার নাই। আমি একজনকে পড়াশোনা করাব। অন্যজন গৃহস্থি (খেতের কাজ) করবে। তোমরা দুই ভাই আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসো, কে পড়াশোনা করবে, আর কে গৃহস্থি করবে। এই নিয়ে যেন পরে ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য না হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন।

ঘটনা শুনে বড় ভাই কাঁদতে শুরু করল। কারণ, তার খুব স্কুলে পড়ার শখ। তার ধারণা হলো, হয়তো এই সুযোগ সে পাবে না। তার ছোট ভাই বড়জনের কান্না দেখে বাবাকে বলল, আমি গৃহস্থি করব। বড় ভাই পড়াশোনা করুক। সেই অঞ্চলে সত্তর মাইলের মধ্যে কোনো স্কুল নেই। সত্তর মাইল দূরে বাচ্চা একটা ছেলেকে জায়গির পাঠানো হলো। অন্যের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে। বিনিময়ে তাদের ফুট-ফরমাশ খাটবে।

গরমের ছুটিতে বালক জায়গির থেকে বাড়িতে ফিরেছে। বালকের মা বললেন, বাবা গো! খাওয়াদাওয়া তারা ঠিকমতো দিত?

বালক বলল, দিত। কিন্তু তরকারিতে লবণ কম বলে খেতে পারতাম না।

তুমি লবণ চাইতা?

আমার লজ্জা করে।

গরমের ছুটির পর বালক জায়গিরে ফিরে যাচ্ছে। বালকের মা তার সঙ্গে বাঁশের চোঙের ভেতর ভরে লবণ দিয়ে দিলেন, যাতে বালককে লবণের কষ্ট না করতে হয়।

বালকের নাম ফয়জুর রহমান আহমেদ। আমার বাবা। অতি দুর্গম গ্রামের তিনি প্রথম ম্যাট্রিকুলেট, তিনি প্রথম গ্র্যাজুয়েট।

মুসলমান একটি ছেলে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে শুনে আঠারোবাড়ীর জমিদার তাকে দেখতে চাইলেন। বাবা খালি পায়ে জমিদারের সামনে উপস্থিত হলেন। সেই সময় ছাতা মাথায় দিয়ে জুতা পরে জমিদারের সামনে যাওয়া যেত না। জমিদার বললেন, বাবা, তুমি জুতা পায়ে আমার কাছে আসার যোগ্যতা অর্জন করেছ। আর কখনো আমার সামনে খালি পায়ে আসবে না।

এই জমিদারের কথা আমি মধ্যাহ্ন উপন্যাসে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জমিদারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গান, 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে' এই জমিদার বাড়িতে লেখা।

বাঁশের চোঙায় লবণ নিয়ে জায়গির বাড়িতে যাওয়ার বিষয়টা একসময় আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। দুপুরে ভাত খাচ্ছি। তরকারিতে লবণ কম হয়েছে। পাতে লবণ নিতেই মা পুরোনো গল্প তুললেন। যেহেতু অনেকবার

www.amarboi.com

শোনা গল্প, আমি হুঁ হুঁ করে গেলাম। মা বললেন, তোদের গ্রামের বাড়িতে আগে যেমন স্কুল ছিল না, এখনো নাই। তুই একটা স্কুল করে দে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করে দূরে দূরে পড়তে যায়।

আমি বললাম, মা! স্কুল-কলেজ করা কোনো লেখকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তবে আপনি চেয়েছেন, আমি স্কুল করে দেব।

মা বললেন, স্কুলটা যেন তোর বাবার নামে হয়।

আমি বললাম, স্কুল হবে স্কুলের নামে। বাবার নামে, মায়ের নামে না। আমি স্কুলের নাম দিলাম 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ'। মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের নামে স্কুল। বাবা একজন শহীদ। কাজেই তাঁর নামও স্কুলে যুক্ত। মা! ঠিক আছে?

কী যে ভয়াবহ এক ঝামেলা সেদিন মাথায় নিলাম, তা আমি জানি আর জানেন বেলাল বেগ।

বেলাল বেগ সম্পর্কে বলি। ঘোরের জগতে বাস করা একজন মানুষ। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছেন। আড়বাঁশির ওস্তাদ মানুষ। আমেরিকানরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি স্কুল করে, তখন তিনি সেই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হন। বিটিভিতে চমৎকার সব শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম করতেন। একটির নাম 'কিন্তু কেন'।

বেলাল বেগের সন্ধান আমাকে দিলেন সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বেলাল বেগের সঙ্গে ছিলেন। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের তিনিও ছিলেন শিক্ষক। বেলাল বেগের সন্ধান করার চেষ্টা করলাম। শুনলাম, তিনি স্ত্রী এবং সংসারের ওপর অভিমান করে সন্দ্বীপে একা বাস করছেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা আমেরিকায় থাকে। তারা বেলাল বেগকে নিয়ে যেতে চায়। বেলাল বেগ নিজের দেশ ছেড়ে যাবেন না।

বেলাল বেগকে সন্দ্বীপ থেকে আনা হলো। আমি তাঁকে স্কুলের কথা বললাম। তাঁর চোখ চকচক করতে লাগল। তিনি আমাকে কিছু শর্ত দিলেন।

www.amarboi.com

১. এই স্কুল আর দশটা স্কুলের মতো হলে চলবে না। এটি হতে হবে এমন এক স্কুল, যা উন্নত দেশের স্কুলের পাশে দাঁড়াবে।

২. স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি শিখবে মোরালিটি।

৩. প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর মাথায় স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে হবে।

আমি বললাম, আপনি আপনার মতো করুন। সব দায়িত্ব আপনার।

বেলাল বেগ ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি চলে গেলেন আমার গ্রামের বাড়ি কুতুবপুরে। গ্রামের মানুষদের আগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্কুলের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে হবে। স্কুলের জন্য একসঙ্গে অনেকখানি জায়গা প্রয়োজন। জায়গা কিনতে হবে। এই অঞ্চলে কোনো রাস্তাঘাট নেই। রাস্তাঘাট করতে হবে। ইলেকট্রিসিটি আনতে হবে।

বেলাল বেগের কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে একদিন আমার মা তাকে ডেকে পাঠালেন। বেলাল বেগের হাত ধরে বললেন, বাবা! একটা পর্যায়ে সবাই আমার ছেলেকে ছেড়ে চলে যায়। তুমি তাকে ছেড়ে যেয়ো না। সে একা স্কুলটা করতে পারবে না।

বেলাল বেগ বললেন, আমি কখনো আপনার ছেলেকে ছেড়ে যাব না। আপনাকে কথা দিলাম।

বেলাল বেগ কথা রাখেননি। স্কুল নির্মাণের মাঝপথে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে গেলেন। আমি স্কুল শেষ করলাম। অপূর্ব আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের কী সুন্দর স্কুল! ডিজাইনার ছিল আর্কিটেকচারের দ্বিতীয় বর্ষের একজন ছাত্রী—মেহের আফরোজ শাওন।

স্কুল তো দাঁড়াল। স্কুল চালাব কীভাবে? কিছুই তো জানি না। আমার সঞ্চিত অর্থের সবটাই গেছে। কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছি, তার একটা উদাহরণ দিই। ১২ বছর আগে খরচ করেছি ৭০ লাখ টাকা। স্কুলের জন্য ফার্নিচার কেনার টাকা নেই। লোহার খুঁটি গাড়া হয়েছে, বেড়া দেওয়ার টাকা নেই।

চেষ্টা করলাম সরকারের হাতে স্কুল তুলে দিতে। সরকারি লোকজন চোখ কপালে তুলে বলল, একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দাঁড়া করিয়ে আপনি দিয়ে দেবেন, তা কীভাবে হবে?

আওয়ামী লীগ, বিএনপি—অনেক দেনদরবার করলাম, তারা কেউ এই দায়িত্ব নেবে না। শিক্ষা শিক্ষা বলে এই দুই দলই মুখে ফেনা তুলে ফেলে, কিন্তু তৈরি একটা স্কুলের দায়িত্ব নেয় না।

একবার মনে হলো স্কুল বাদ, স্কুলের বদলে হাসপাতাল বানালে কি কেউ দায়িত্ব নেবে? প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা হাসপাতাল তো দরকার। সেই চেষ্টাও বিফল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের লোকজন এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি একজন মানসিক প্রতিবন্ধী।

গেলাম ব্র্যাকের কাছে। তারা যদি কিছু করে। ব্র্যাকের কর্মকর্তারা এলেন, দেখলেন, প্রচুর খাওয়াদাওয়া করলেন এবং চলে গেলেন।

একসময় স্কুলের ২৬০টি কাচের জানালা ভেঙে পড়ল। লাইব্রেরি ঘর হিসেবে যেটা বানানো হয়েছিল, সেখানে নেশাখোরেরা গাঁজা খাওয়ার আসর বসাল। স্কুলের মাঠে সরিষা বুনে দেওয়া হলো। স্কুলের চারপাশের লোহার খুঁটিগুলো তুলে গ্রামের মানুষেরাই সের দরে বাজারে বেচে দিল। স্কুল ভবন গরু-ছাগল রাখার স্থায়ী নিবাসে পরিণত হলো।

এক রাতে খেতে বসেছি। আমার মা দুঃখিত গলায় বললেন, তোকে দিয়ে স্কুল বানানোর সিদ্ধান্ত ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। তুই আমার ওপর কোনো রাগ রাখিস না। দান গ্রহণ করতেও যোগ্যতা লাগে, তোর গ্রামের সেই যোগ্যতা নেই।

আমি বললাম, মা! আমি হচ্ছি কচ্ছপ। কচ্ছপ একবার যা কামড়ে ধরে তা ছাড়ে না। কচ্ছপের কামড় থেকে বাঁচার একটাই উপায়—তার গলা কেটে ফেলা। স্কুল আমি একাই চালাব।

হ্যাঁ, স্কুল চলছে। পাসের হার ১০০ ভাগ। এ বছর বৃত্তি পেয়েছে পাঁচটি ছেলেমেয়ে।

আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, পুরো বাংলাদেশে এই স্কুলের চেয়ে সুন্দর স্কুল নেই। কোনো স্কুলের এত বড় লাইব্রেরি নেই। এতগুলো কম্পিউটার নেই। আমি আমার স্কুলে এখন পর্যন্ত কোনো রাজনীতিবিদকে (এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদি) নিতে পারিনি। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তাদের আমার প্রয়োজনও নেই।

পাদটীকা-১

বৃদ্ধ কচ্ছপ এইবার 'ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার' কামড়ে ধরেছে। কচ্ছপের কামড় বলে কথা। বেঁচে থাকলে কচ্ছপ যে ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার করে যাবে, তা নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়।

আমার পরিকল্পনা হলো, তিনজন ভিক্ষুকের কাছ থেকে প্রথম ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের জন্য অর্থ ভিক্ষা নেওয়া হবে। এদের ছবি তুলবেন নাসির আলী মামুন। স্কেচ করবেন ও ইন্টারভিউ নেবেন মাসুক হেলাল। তারপর আমরা যাব বাংলাদেশের তিন শীর্ষ ধনী মানুষের কাছে। ভিক্ষুকেরা দান করেছে শুনে তাঁরা লজ্জায় পড়ে কী করেন, আমার দেখার ইচ্ছা।

শীর্ষ ধনীর পর আমরা যাব তিন রাজনীতিবিদের কাছে। তাঁরা কিছুই দেবেন না আমরা জানি। তাঁরা নিতে জানেন, দিতে জানেন না। তবে খালি হাতে আমাদের ফেরাবেন না। উপদেশ দেবেন। আমাদের উপদেশের তো প্রয়োজন আছে।

তিন সংখ্যাটা কেন—এই প্রশ্ন আসতে পারে। পিথাগোরাসের মতে, তিন হচ্ছে সবচেয়ে রহস্যময় সংখ্যা। এটি একটি প্রাইম নাম্বার। তিন হচ্ছে ত্রিকাল—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। তিন হলো ট্রিনিটি। তিন মানে আমি, তুমি ও সে।

'That holy dream that holy dream

....

Hath cheered me as a lovely beam
A lonely spirit guiding.’

—Edgar Allan Poe
(A Dream)

কেয়ারগিভার

হুমায়ূন আহমেদ

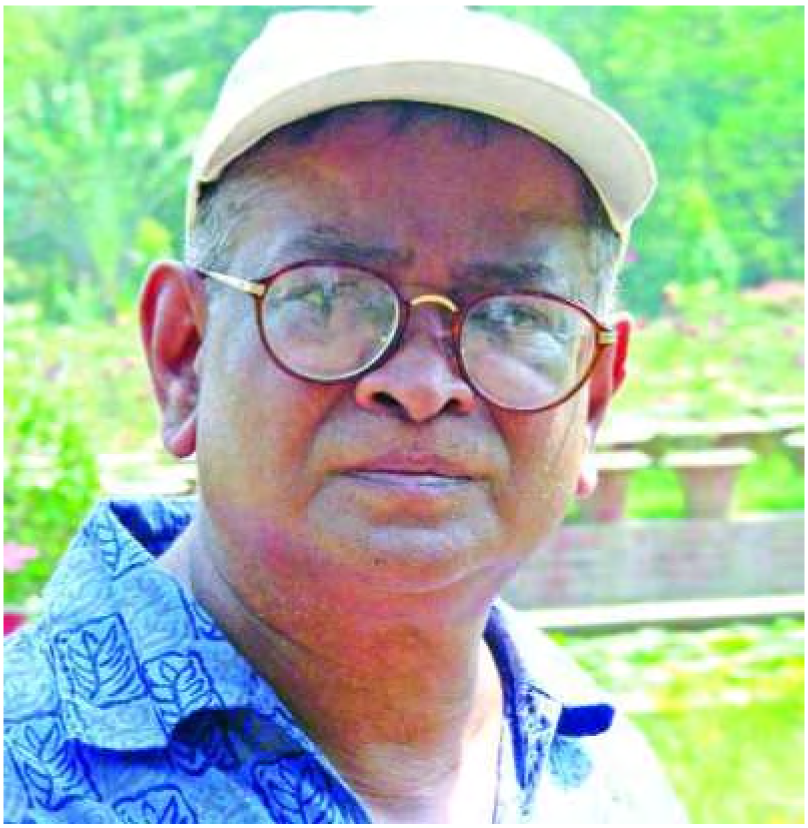

'কেয়ারগিভার' শব্দটির বাংলা—যে সেবা দান করে। স্লোয়ান-কেটারিংয়ে চিকিৎসা নিতে এসে কেয়ারগিভার শব্দের অর্থ নতুন করে জানলাম। হাসপাতালের কাছে রোগী যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার কেয়ারগিভার সে রকমই গুরুত্বপূর্ণ। কেয়ারগিভারের নাম হাসপাতালে তালিকাভুক্ত করা হলো—মেহের আফরোজ শাওন। রোগীর স্ত্রী। চিকিৎসকেরা কেয়ারগিভার ছাড়া আর কারও সঙ্গেই রোগ নিয়ে বা চিকিৎসা নিয়ে কোনো কথা বলবেন না।

রোগীর রক্ত নেওয়া হচ্ছে বা কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে, তখনো শুধু কেয়ারগিভারের উপস্থিতি থাকবে। আর কেউ থাকবে না।

কেমো দেওয়ার পদ্ধতিটাও সুন্দর। প্রথম একজন নার্স প্যাকেট ভর্তি করে কয়েক ব্যাগ ওষুধ নিয়ে আসবে। কেয়ারগিভার ও রোগীকে প্রতিটি ওষুধের নাম বলবে। তারপর সে বিদায় নেবে। আসবে দ্বিতীয় নার্স। সেও একই কাজ করবে। প্রতিটি ওষুধের নাম বলবে। ডাবল চেকিং। যাতে কখনো কোনো ভুল না হয়। ঠিক রোগীকে ঠিক

কেমো দেওয়া হচ্ছে কি না, নাকি ভুল অন্য কাউকে দেওয়া হচ্ছে, তার পরীক্ষাও আছে। দুজন নার্সই আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করবে—

তোমার নামের শেষ অংশ কী?

আহমেদ।

প্রথম অংশ কী?

হুমায়ূন।

জন্মতারিখ বলো।

জন্মতারিখ বলতে গিয়ে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। ১৩ নভেম্বর আমার জন্ম, পাসপোর্টে লেখা এপ্রিলের ১০ তারিখ। হাসপাতালে পাসপোর্টের জন্মতারিখ লেখা হয়ে আছে। কাজেই যতবার আসল জন্মদিন বলেছি, হইচই শুরু হয়েছে। এই রোগী কি সেই রোগী, নাকি অন্য কেউ? পাত্তা লাগাও, পাত্তা লাগাও। তাড়াতাড়ি করো।

রোগীর সেবা ছাড়াও কেয়ারগিভারকে আরও কিছু ঝামেলার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। ক্যানসারে আক্রান্তদের অনেক ধরনের সমিতি আছে। তাদের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। তাদের সামলাতে হয়। বেশির ভাগ সমিতিই হলো রোগীর ডিপ্রেশন কাটানোবিষয়ক।

একটি সমিতি দেখলাম, বেঁচে থাকার অর্থ এবং আনন্দ বোঝানোর সমিতি। এক ঘণ্টা বাড়তি বেঁচে থাকাও বিশাল ব্যাপার, এ জাতীয় বিষয়। এর সঙ্গে আছে প্রেয়ার গ্রুপ অর্থাৎ দোয়া পার্টি বা স্পিরিচুয়াল কাউন্সেলিং। সব ধর্মের রোগীদের জন্যই দোয়ার ব্যবস্থা আছে।

আমার কেয়ারগিভার সব ঝামেলা হাসিমুখে সহ্য করে আমার সঙ্গেও সার্বক্ষণিক হাস্যমুখী থাকার চেষ্টা করে। মনে হয়, তাকে হাসপাতাল হাসি হাসি মুখে রোগীর সঙ্গে থাকতে বলে দেওয়া হয়েছে।

একদিন লক্ষ করলাম, সে ঝিম ধরে কম্পিউটারের ফেসবুকের পাতার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের পাতায় অশ্রুবিন্দু।

আমি বললাম, সমস্যা কী?

কেয়ারগিভার বলল, কোনো সমস্যা না। সামান্য মন খারাপ। কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছি।

আমি বললাম, আমাকে বলো, দেখি, মন খারাপ কাটানোর চেষ্টা করতে পারি কি না।

তোমাকে বলব না। তোমার মন খারাপ হবে।

আমি বললাম, সহজে মন খারাপ হবে, এমন মানুষ আমি না। বুঝতে পারছি, ফেসবুকে পাঠানো কারও কমেন্ট পড়ে তুমি আপসেট হয়েছ। কী লিখেছে?

শাওন পড়ে শোনাল। কেউ একজন লিখেছে, তোমার উচিত শিক্ষা হয়েছে। আমি খুশি যে তোমার স্বামীকে ক্যানসার দিয়ে আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিলেন। এই শিক্ষা তোমার আরও আগেই হওয়া উচিত ছিল।

শাওনের মেয়ে লীলাবতী যখন মারা গেল, তখনো সে এ ধরনের চিঠিপত্র পেত। লেখা থাকত, তোমার কঠিন শাস্তি হওয়ায় আমরা খুশি। আরও শাস্তি হবে। এই ধরনের কথা।

আমি শাওনকে বললাম, পৃথিবীতে মানসিক অসুস্থ অনেক মানুষ। তাদের নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। আমরা ভাবব সুস্থ মানুষদের কথা। তোমার ফেসবুকে শত শত মানুষ কত চমৎকার সব কথা লিখছে। লিখছে না?

হ্যাঁ।

এর মধ্যে একজনের কথা চিন্তা করো। সে চলে গেছে মক্কায়, কাবা শরিফে। সেখান থেকে তোমাকে জানিয়েছে, আমি স্যারের জন্য দোয়া করতে এসেছি। শাওন আপু, আপনি একটুও চিন্তা করবেন না। এর পরও কি মন খারাপ করা তোমার উচিত?

শাওন বলল, না, উচিত না।

তাহলে মিষ্টি করে একটু হাসো।

হাসতে পারব না।

বলেও সে হাসল।

আমাদের আশপাশে বিকৃত মানসিকতার মানুষের সংখ্যা কি বাড়ছে? মনে হয় বাড়ছে। একজনের কথা বলি, সে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য হাস্যকর কাণ্ডকারখানা শুরু করল। একটা পর্যায়ে গেটের সামনে স্ট্রাইক করার মতো অবস্থা। মহা বিরক্ত হয়ে তাকে আসতে বললাম। ২৩-২৪ বছরের যুবক। কঠিন চোখমুখ। আমি বললাম, এখন বলো, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? বিশেষ কিছু কি বলতে চাও?

চাই।

তাহলে বলে ফেলো।

আপনার লেখা আমার জঘন্য লাগে।

এই কথাটা বলার জন্য এত ঝামেলা করেছ?

হ্যাঁ! কারণ সরাসরি এই কথা আপনাকে বলার কারোর সাহস নাই। সবাই আপনার চামচা।

আমি বললাম, আরও কিছু কি বলবে?

হ্যাঁ।

বলে ফেলো।

সে ইংরেজিতে বলল, আই ওয়ান্ট ইউ টু ডাই সুন।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম (ইংরেজিতে), আই হোপ অ্যান্ড প্রে ইউ হ্যাভ আ লং অ্যান্ড মিনিংফুল লাইফ।

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

কলোরাডো! রকি মাউনটেন হাই

হুমায়ূন আহমেদ

সন্ধ্যাবেলা লেখার টেবিলে বসেছি। উদ্দেশ্য, একটা ভয়ংকর ভূতের গল্প লিখব। বাংলাদেশের ভূতের গল্পে নরম-সরম ব্যাপার থাকে। আমাদের ভূত-পেতনিরা মাঝেমধ্যে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। রাতে গ্রামের কোনো বাড়িতে তরুণী বধূ ইলিশ মাছ ভাজছে। গন্ধে গন্ধে পেতনি উপস্থিত হবে। নাকি গলায় বলবে, ‘এঁকটা ভাঁজা মাঁছ দিঁবি?’ নিশিরাতে বাঁশগাছের ওপর বসে তারা গাছ ঝাঁকায়। খিক খিক করে হাসে। কেউ কেউ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গৃহস্থের নাম ধরে ডাকে। এসব।

আমেরিকান ভূতেরা ভয়ংকর। সিরিয়াল কিলার টাইপ। তাদের মধ্যে মানবিক কোনো ব্যাপারই নেই। সবই ‘ভূতবিক’ ব্যাপার।

আমার চেষ্টা বাংলাদেশের পটভূমিকায় আমেরিকান ভূতের গল্প লেখা। কলজে কাঁপানো ভয়ংকর গল্প।

লিখতে বসে দেখি ভূতের গল্প আসছে না, গান আসছে। আমি ভাবলাম, গান অনেক দিন লেখা হয় না। একটা লেখা হোক। লেখা হলো।

শাওন পড়ে বলল, গান হয়নি, কবিতা হয়েছে।

আমি বললাম, কবিতাও হয়নি। ছন্দের ত্রুটি আছে। তবে দুর্বল এই কবিতায় সুর বসালেই ত্রুটি কাটবে।

শাওন বলল, সুর বসালেও এই গান যেন কখনো গীত না হয়। এই গানে শাওনের নাম এসেছে। কোনো পুরুষ-গায়ক হুমায়ূন আহমেদ সেজে আমার নাম নিয়ে গান করবে, তা হবে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে। সুর বসুক। তোমাকে কথা দিলাম, এই গান গীত হবে না।

প্রয়াত সংগীতকার সত্য সাহা আমাকে বলেছিলেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি একটা পত্রিকার পলিটিক্যাল সাব-এডিটরিয়াল আমাকে এনে দিন, আমি সুর করে দেব।

সত্য সাহা নেই। তাঁর পুত্র ইমন সাহা আছে। দেখি, সে কিছু করতে পারে কি না। আশা কম। পুত্র এখনো পিতাকে ছাড়িয়ে যায়নি।

ইমনের একটি গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। সে আমার ঘেঁটুপুত্র কমলা ছবির মিউজিক ডিরেক্টর। প্রায়ই তার স্টুডিওতে কাজ কত দূর হলো দেখতে যাই। সে দুনিয়ার মিষ্টি কিনে আনে, যদিও জানে, ডায়াবেটিস নামের ব্যাধির কারণে হতাশ চোখে মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। সে সম্ভবত আমার হতাশ দৃষ্টিটাই দেখতে চায়। হাঃ হাঃ হাঃ।

যে রাতে কর্কট ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ঢাকা থেকে রওনা হব, সেই রাতে সে আমাকে দেখতে এল। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে এসেই আমার বাঁ হাত ধরে কচলাকচলি করতে লাগল। একপর্যায়ে আমি বললাম, ইমন, তোমার সমস্যা কী? তুমি তো আমাকে অচল করে দিচ্ছ।

ইমন লজ্জিত গলায় বলল, স্যার, দুই দিন আগে আমি আপনাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছি। এই জন্য এমন করছি। স্বপ্নটা বলব?

বলো।

আমি দেখেছি, আপনি ঘেঁটুপুত্র কমলার মিউজিক শুনতে এসেছেন। আপনার শরীরটা ভালো না বলে সোফায় শুয়ে আছেন। আপনার শরীরের খোঁজ নেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে গেলাম। গিয়েই চমকে উঠে দেখি আপনি না। আমার বাবা শুয়ে আছেন। আমি ছুটে গিয়ে বাবার হাত ধরলাম। অনেকক্ষণ ধরে থাকলাম, তারপর ঘুম ভেঙে গেল।

আমি বললাম, ইমন! তুমি তো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছ। তুমি তোমার মৃত বাবার হাত কচলে এখন আমার হাত কচলাচ্ছ। আমাকেও মৃত বানানোর চেষ্টা?

বেচারার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সে আমার হাত ছেড়ে দিল। আমি বললাম, ঠাট্টা করছি। তুমি আমার দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছ। আমার ঠাট্টা-তামাশায় অভ্যস্ত হতে হবে। একটা কথা তোমাকে বলি, গানবাজনায় তোমার উন্নতিতে তোমার স্বর্গবাসী পিতা যেমন খুশি হবেন, আমিও ঠিক তেমনি খুশি হব। এখন আমার ডান হাতটা কচলাও। দুটি হাত ব্যালান্স হওয়া প্রয়োজন।

আচ্ছা, এখন দুর্বল কবিতা পড়া যাক। যাদের ভেতরে সুর আছে তারা দয়া করে সুর বসিয়ে পড়ুন।

ডেনভার থেকে হঠাৎ নিমন্ত্রণ

সেখানে নাকি উৎসব হবে

সারা রাত জেগে জ্যাজ সংগীত।

গিটারের ঝনঝন\

জ্যাজ আমার প্রিয় গীতি তা কি হয়?

মনে তাই জাগে কঠিন এক সংশয়

কোনো অজুহাতে ‘যাব না’ বলব কি?

বড় অভিমানী, ডেনভারবাসী শাওনের পূরবী দি।

তাঁর দুই চোখে সুরমা ও কুশিয়ারা

তুচ্ছ কারণে নামে দুই নদীধারা।

আমি বললাম, ‘যাব’।

পূরবী কারণে ডেনভারে ধরা খাব।

দুঃখ ও শোকে ক্লান্ত থাকবে মন

সারা রাত জেগে জ্যাজ সংগীত

গিটারের ঝনঝন।

উৎসব শেষ, আমিও শেষ প্রবল জ্বরে কাতর।

আমার কপালে হাত রেখে দেখি শাওন হয়েছে পাথর।

জ্বর কিছু নয়, তার চেয়ে ভয় ক্যানসার আছে পিছু।

আমি বললাম, শাওন, জানো কি?

রকি মাউনটেন হিমালয়েরও উঁচু।

শাওন বলল, তোমার মাথা এলোমেলো তাই বিশ্রাম প্রয়োজন।

ভুল হয়েছে উৎসবে আসা

গিটারের ঝনঝন।

আমি বললাম, এসো। বাজি রাখো। রকি মাউনটেন হাই

তার আশপাশে কোনো পর্বত নাই।

কে বলেছে জানো?

জন ডেনভার! মন দিয়ে শুধু শোনো।

মধুক্ষরা স্বরে তিনি গেয়েছেন,

‘রকি মাউনটেন হাই’

কাজেই তার চেয়ে উঁচু পর্বত

এই পৃথিবীতে নাই।

পরের দিনের কথা।

গায়ের জ্বর আরও বেড়েছে, নিঃশ্বাসে বড় কষ্ট।

শরীর ও মন অচল আমার

বিষয়টা হলো স্পষ্ট।

তাতে কী হয়েছে, শাওন তো আছে।

তাকে নিয়ে যাব রকি পর্বতে

শাওন গাইবে মধুমাখা স্বরে

রকি মাউনটেন হাই

কলোরাডো! রকি মাউনটেন হাই

ডেনভারে যাওয়ার আগেই এই গান লেখা। গান শুনে মনে হতে পারে, নিতান্ত অনিচ্ছায় শুধু পূরবীর মন রক্ষায় সেখানে গেছি। 'ইহা সত্য নহে।' আমি ডেনভার গেছি দুই পুত্রকে ডেনভার দেখাতে এবং শাওনকে রকি পর্বতমালা দেখাতে।

রকি পর্বতমালা নিয়ে আমার নস্টালজিয়া আছে। কী নস্টালজিয়া, তা ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না।

পাদটীকা

পাঠকের যেমন মৃত্যু হয়, শ্রোতারও মৃত্যু হয়। অতি প্রিয় গান একসময় আর প্রিয় থাকে না। তবে কিছু গান আছে, কখনো তার আবেদন হারায় না। আমার কাছে মরমি কবি গিয়াসুদ্দিনের একটি গান সে রকম। ওল্ড ফুলস ক্লাবের প্রতিটি আসরে একসময় এই গান গীত হতো। শাওনের প্রবল আপত্তির কারণে এই গান এখন আর গীত হয় না। গানটির শুরুর পঙিক্ত—

মরিলে কান্দিস না আমার দায়

ও জাদুধন! মরিলে কান্দিস না আমার দায়।

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

তিন ডব্লিউ

হুমায়ূন আহমেদ

কোনো নিউইয়র্কবাসীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আবহাওয়া আজ কেমন যাবে?

সে হতাশ ভঙ্গি করে বলে, তিন ডব্লিউ! তিন ডব্লিউর বিষয়ে কিছু বলা ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব না।

তিন ডব্লিউ হচ্ছে—

১. Women

হ্যাঁ, মেয়েদের বিষয়ে কিছু বলা সব দেশের জন্যই কঠিন।

২. Work

'কাজ' আমেরিকায় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আসলেই ভয়াবহ। অকারণ দেশ দখল করে করে দেউলিয়ার কাছাকাছি। লিবিয়া চলে গেল। পরবর্তী দেশ কোনটি, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

৩. Weather

তিন ডব্লিউর শেষটি Weather। নিউইয়র্কের জন্য সম্ভবত এটা সত্যি। অক্টোবরে এখানে কখনো বরফ পড়ে না। এই অক্টোবরে বরফ পড়ে একাকার। মানুষ মারা গেছে তিনজন। আমেরিকানের মৃত্যু সহজ কথা না।

যা-ই হোক, বরফপাতের গল্প বলি। সকাল নয়টা বাজে। আমার পুত্র নিষাদ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, বাবা ‘ভয়মকর’ অবস্থা। (পুত্র ভয়ংকর বলতে পারে না, বলে ভয়মকর।)

আমি বললাম, ঘটনা কী?

সে বলল, আকাশের সাদা মেঘগুলো মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

বাংলা ভাষার লেখকদের বরফপাতের বর্ণনায় থাকে, ‘পেঁজা তুলার মতো বরফ পড়ছে।’ এর বাইরে আমি কিছু পাইনি। শিশুর কাছে শুনলাম, আকাশের সাদা মেঘ নেমে এসেছে। নবীজি (দ.) বলেছেন, ‘বিদ্যাশিক্ষার জন্য সুদূর চীনে যাও।’ আমি বলছি, ভাষা শিক্ষার জন্য শিশুদের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

থাকুক এই প্রসঙ্গ। তৃতীয় ডব্লিউ নিয়ে কথা বলি। আগের দিন প্রচণ্ড ঠান্ডা গিয়েছে। বাড়ির বয়লার ফেটে গেছে। হিটিং কাজ করছে না। আমরা ঠান্ডায় জবুথবু। পরদিনই আবহাওয়া উষ্ণ। ঝলমলে রোদ।

আমি গায়ে রোদ মাখানোর জন্য ঘরের বাইরে রোদে বসেছি। হাতে কফির মগ। আমার সামনে পাশের বাড়ির গায়ানিজ এক যুবক এসে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, গ্র্যান্ডপা। কেমন আছ?

আমি ধাক্কার মতো খেলাম। এই প্রথম এমন বয়স্ক মানুষ আমাকে ‘গ্র্যান্ডপা’ ডাকল। তাহলে কি আমার চেহারা গ্র্যান্ডপা ডাকার মতো হয়ে গেছে!

শাওন বলল, গ্র্যান্ডপা ডাকায় তোমার কি মন খারাপ লাগছে?

আমি বললাম, লাগছে।

শাওন বলল, তোমার নিজের নাতি-নাতনি আছে। তারা যদি তোমাকে ‘গ্র্যান্ডপা’ ডাকে, তাহলে কি তোমার খারাপ লাগবে?

আমি বললাম, অবশ্যই না।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলাম। আসলেই তো। গ্র্যান্ডপা ডাকায় আমার মন খারাপ হবে কেন?

আমার এখন চার নাতি-নাতনি। আমি যেখানে বাস করি, তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ বলে এদের আমি দেখি না। ওরাও গ্র্যান্ডপা ডাকার সুযোগ পায় না।

'এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং'।

আমার কর্কট রোগের সিলভার লাইনিং হলো, এই রোগের কারণে প্রথমবারের মতো আমার তিন কন্যা আমাকে দেখতে তাদের সন্তানদের নিয়ে 'দখিন হাওয়া'য় পা দিল। ঘরে ঢুকল তা বলা যাবে না। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। সূর্যের চেয়ে বালি গরম হয়—এই আপ্তবাক্য সত্য প্রমাণ করার জন্য মেয়েদের স্বামীরা মুখ যতটা শক্ত করে রাখার, ততটা শক্ত করে রাখল।

অবশ্য আমিও সেই অর্থে তাদের দিকে যে ফিরে তাকালাম, তা না। ঘরভর্তি মানুষ। মেয়েদের দেখে হঠাৎ যদি আবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে কেঁদে ফেলি, সেটা ভালো হবে না।

আমি আমার তিন ডব্লিউর অর্থাৎ তিন কন্যার গল্প বলি।

১. প্রথম ডব্লিউ

নোভা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছে। আমেরিকা থেকে পিএইচডি করে বর্তমানে দেশে ফিরেছে। পিএইচডি ডিগ্রির সঙ্গে সে হিজাবও নিয়ে এসেছে। মাশআল্লাহ, কেয়া বাত হায়।

আমি যখন নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছি, তখনকার কথা। ইউনিভার্সিটি আমাকে বাগান করার জন্য দুই কাঠা জমি দিয়েছে। আমি মহা উৎসাহে শাইখ সিরাজ হয়ে গেলাম। খুন্তি, খুরপি, কোদাল কিনে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। মহা উৎসাহে জমি কোপাই, পানি দিই। বীজ বুনি। আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী কন্যা নোভা।

বিকেল পাঁচটায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে দেখি, বাড়ির সামনে খুরপি ও কোদাল নিয়ে নোভা বসে আছে। প্রথমে জমিতে যেতে হবে, তারপর বাসায় ঢোকা। যেদিন ফসলে জমি ভরে গেল, সেদিনের দৃশ্য—মেয়ে গাছ থেকে ছিঁড়ে টকটকে লাল টমেটো প্লাস্টিকের বালতিতে ভরছে এবং বলছে, বাবা, আই মেইড ইট! (মেয়ে তখনো বাংলা বলা শেখেনি)।

মেয়ের আনন্দ দেখে চোখ মুছলাম।

২. দ্বিতীয় ডব্লিউ

নাম শীলা। শুরুতে ছিল শীলা আহমেদ। স্বামী এসে স্ত্রীর নামের শেষে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বাবাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দেয়। এখন শীলার নামের অবস্থা কী জানি না। এই মেয়েটিও বড় বোনের মতো মেধাবী। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স ও এমএতে ইকোনমিকসে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে।

এখন তার গল্প। তখন শীলার বয়স ১২ কিংবা ১৩।

সবাইকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়েছি। হোটেলে ওঠার সামর্থ্য নেই। বন্ধু ফজলুল আলমের বাসায় উঠেছি (ফজলুল আলম হচ্ছে আগুনের পরশমণির শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলমের ছোট ভাই।)

আমি ক্যাম্পিং পছন্দ করি, ফজলু জানে। সে বনে ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করল। আমরা জঙ্গলে এক রাত কাটাতে গেলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। তাঁবুর ভেতর জড়সড় হয়ে শুয়ে আছি। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙল। দেখি, শীলা বসে আছে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি বললাম, মা, কী হয়েছে?

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

আমি বুঝলাম, এই মেয়ে কঠিন ক্লস্ট্রোফোবিয়া। আসলেই সে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। আমি বললাম, গরম কাপড় পরো। তাঁবুর বাইরে বসে থাকব।

সে বলল, একা একা থাকতে পারব না। ভয় লাগে। কিছুক্ষণ একা থাকতে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, আমি সারা রাত তোমার পাশে থাকব।

তাই করলাম। মেয়ে একপর্যায়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাল। সকাল হলো। মেয়ের ঘুম ভাঙল।

সে বলল, বাবা, তুমি একজন ভালো মানুষ।

আমি বললাম, মা! পৃথিবীতে অসংখ্য খারাপ মানুষ আছে, একজনও খারাপ বাবা নেই।

এখন মনে হয় শীলা বুঝে গেছে—পৃথিবীতে খারাপ বাবাও আছে। যেমন, তার বাবা।

৩. তৃতীয় ডব্লিউ

তৃতীয় কন্যার নাম বিপাশা। অন্য সব ভাইবোনের মতোই মেধাবী (বাবার জিন কি পেয়েছে? হা হা হা। আমাকে পছন্দ না হলেও আমার জিন কিন্তু মেয়েকে আজীবন বহন করতে হবে।)

এই মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিকসে অনার্স এবং এমএতে প্রথম শ্রেণী পেয়ে আমেরিকায় কী যেন পড়ছে। আমি জানি না।

আমার ধারণা, এই মেয়েটি অসম্ভব রূপবতী বলেই খানিকটা বোকা। তার বালিকা বয়সে আমি যখন বাইরে কোথাও যেতাম, সে আমার সঙ্গে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি দিয়ে দিত। এই শিশিতে নাকি তার গায়ের গন্ধ সে ঘষে ঘষে ঢুকিয়েছে। তার গায়ের গন্ধ ছাড়া আমি ঘুমুতে পারি না বলেই এই ব্যবস্থা।

যেদিন আমি আমেরিকা রওনা হব, সেদিনই সে আমেরিকা থেকে তিন মাসের জন্য দেশে এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একবার ভাবলাম, বলি—মা, অনেক দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরব কি না, তা-ও জানি না। এক শিশি গায়ের গন্ধ দিয়ে দাও। বলা হলো না।

আমার তিন কন্যাই দূরদ্বীপবাসিনী। ওরা এখন আমাকে চেনে না, হয়তো আমিও তাদের চিনি না। কী আর করা? কে সারা সারা!

পাদটীকা

ফ্রম এভরি ডেপ্থ্ অব গুড অ্যান্ড ইল

দ্য মিস্ট্রি হুইচ বাইন্ডস মি স্টিল।

ফ্রম দ্য টরেন্ট অর দ্য ফাউন্টেন,

ফ্রম দ্য রেড ক্লিফ অব দ্য মাউন্টেন

মাই হার্ট টু জয় অ্যাট দ্য সেইম টোন

অ্যান্ড অল আই লাভড্, আই লাভড্ অ্যালোন।

(এডগার অ্যালান পো)

তিনি এসেছিলেন

হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যের প্রায় কিংবদন্তিতুল্য এক নাম। পাঠকপ্রিয় এই লেখক প্রায় বিরামহীনভাবে লিখে গেছেন। এখনো তাঁর কলম সমান সচল, কিন্তু তাঁর লড়াই চলছে ক্যানসার নামের এক ব্যাধির সঙ্গেও। নিউইয়র্কে চিকিৎসাধীন এই কীর্তিমান লেখকের ৬৩তম জন্মদিন আগামী ১৩ নভেম্বর। তাঁর জন্মদিন সামনে রেখেই আমাদের এই বিশেষ আয়োজন

পুত্র নিষাদ 'ভয়ংকর' বলতে পারে না। সে বলে 'ভয়মকর'। যে বাড়িতে এখন সে বাধ্য হয়ে বাবার সঙ্গে বাস করছে, সেখানে তার কাছে 'ভয়মকর' একটি ঘর আছে। ঘরটি বেসমেন্টে, অর্থাৎ মাটির নিচে। সেখানে হিটিং সিস্টেমের যন্ত্রপাতি বসানো। উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প যন্ত্রপাতিতে তৈরি করে সারা বাড়িতে ছড়ানো হয়। যন্ত্রপাতি থেকে সারাক্ষণ ভৌতিক শব্দ আসে।

আমেরিকানরা বেসমেন্ট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয়(?) আবর্জনা জমা করে রাখার জন্য। আমেরিকান সব ভূতের ছবিতে বেসমেন্টের ভূমিকা থাকবেই।

আমি ঠিক করেছি, অন্তত একটি গল্প এই বেসমেন্টে বসে লিখব। লেখার সময় সম্পূর্ণ একা থাকব। কেউ উঁকি দিতে পারবে না। ভৌতিক গল্পের নাম দিয়েছি 'আদর'। প্রথম কয়েকটি লাইন: 'মিস রাকার কুকুরের নাম "আদর"। নামের সঙ্গে কুকুরের ভাবভঙ্গি যায় না। তাকে দেখেই মনে হয় সে মিস রাকার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার মতলব আঁটছে।'

গল্প নিয়ে আমি এগোতে পারছি না। যখনই বসি, তখনই খবর আসে অতিথি এসেছে। অতিথি কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলবেন।

বাংলাদেশি এই সামাজিকতা আমার কাছে (নিষাদের ভাষায়) ‘ভয়মকর’। এই সামাজিকতায় রোগী দেখতে যাওয়া বাধ্যতামূলক। শুধু দেখতে গেলে হবে না, দেখতে যাওয়ার বিষয়টি অন রেকর্ড থাকতে হবে। রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনকে জানাতে হবে—অমুক দেখতে এসেছিল। এতক্ষণ ছিল। পথ্য হিসেবে এসব বস্তু এনেছে।

মরণাপন্ন রোগী। ডাক্তার ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, দর্শনার্থী তাঁকে ডেকে তুলে বলবেন, ঘুমাচ্ছিলেন? আহা, উঠলেন কেন? আপনার ঘুম দরকার। ডাক্তার কী বলেছেন বলুন তো, শুনি। আপনার নিজের মুখে না শুনলে আমার মন শান্ত হবে না। ভালো কথা ভাই সাহেব, পরে ভুলে যাব। এক হালি কচি ডাব এনেছি। আপনার বেডের নিচে রেখেছি, মনে করে খাবেন। শরীর শুদ্ধির জন্য কচি ডাব অত্যন্ত উপকারী...

আমেরিকা নানান সংস্কৃতির মানুষের জগাখিচুড়ি বলেই আলাদা আমেরিকান কালচার বলে কিছু তৈরি হয়নি। তবে হাসপাতাল এটিকেট মনে হয় তৈরি হয়েছে। চিকিৎসার জন্য অপেক্ষায় থাকা রোগীরা কারও সঙ্গেই কথা বলে না। বেশির ভাগ রোগীকে একা আসতে দেখা যায়। রোগী সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরবে, এত সময় তাদের কোথায়? এক বৃদ্ধকে দেখলাম নিজের অক্সিজেন সিলিন্ডার নিজেই টেনে টেনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। তার সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসছে না।

বাংলাদেশি রোগ-সংস্কৃতি এই দিক দিয়ে ভালো। আমরা কিছু করতে পারি বা না পারি, উদ্বিগ্ন গলায়, অপরিচিত গলায় রোগীর সঙ্গে দুটা কথা বলি।

এই সংস্কৃতি অবশ্যই এশিয়ান। সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে দেখেছি, রোগী দেখতে দুনিয়ার আত্মীয়স্বজন আসছে। রোগীর ঘরে সারাক্ষণ ক্যাওম্যাও শব্দ।

আমেরিকায় আমাকে কঠিন নির্দেশাবলি দিয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে আছে—

এক. কারও কাছ থেকে ফুল বা ফুলের তোড়া গ্রহণ করা যাবে না। (কেমো নেওয়ার সময় শরীরের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যায় বলেই এই সতকর্তা।)

দুই. কারোর কাছাকাছি যাওয়া যাবে না, পাশে বসা যাবে না।

দুই নিষেধাজ্ঞা আমি মেনে চলছি। শুধু একবারই নিষেধ ভেঙেছি। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে ফুলের তোড়া নিয়েছি, তাঁর পাশে বসেছি।

কোনো প্রধানমন্ত্রীর এত কাছে বসা এ-ই আমার প্রথম, এ-ই নিশ্চয়ই শেষ।

প্রধানমন্ত্রীর আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা আমার কাছে এতই স্বাভাবিক বলে মনে হলো, আমি বলেই ফেললাম, আপনার কথাবার্তা তো মোটেই প্রধানমন্ত্রীর মতো লাগছে না।

যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা ইচ্ছা থাকলেও স্বাভাবিক আচরণ করতে পারেন না। সারাক্ষণ তাঁদের ক্যামেরা অনুসরণ করে, সিকিউরিটির লোকজন অনুসরণ করে। তাঁরা জানেন, তাঁদের প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও লক্ষ করা হচ্ছে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক থাকা শুধু মহাপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে—মহাপুরুষদের বইপত্রে পাওয়া যায়, বাস্তবে পাওয়া যায় না।

প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের মানুষদের সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি করেন তাঁর অতি কাছের লোকজন। এঁরা এমন এক মানববন্ধন তৈরি করেন যে, বন্ধন ভেদ করে কারও পক্ষেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এই মানববর্মের প্রধান (এবং হয়তো বা একমাত্র) কাজ হলো নিজের অবস্থান ঠিক রাখা, প্রধানমন্ত্রীর কাছের মানুষ হয়ে থাকা। এ কাজটি করার জন্য তাঁরা প্রধানমন্ত্রী পছন্দ করবেন, এমন কথাগুলোই শুধু তাঁকে শোনান। এমন একটি বাক্যও বলেন না, যা শুনে প্রধানমন্ত্রীর ভালো লাগবে না, অথচ তাঁর শোনা উচিত।

কী সর্বনাশ! আমি দেখি রাজনীতির কচকচানি শুরু করেছি। এও বাঙালি কালচার, সুযোগ পেয়ে কোনো বাঙালি রাজনীতির কপচাবে না, তা হবে না। আমি আমার প্রগলভতার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী অনেক ব্যস্ততার ভেতর বাংলাদেশের একজন লেখকের জন্য আলাদা সময় বের করেছেন, এটা অনেক বড় ব্যাপার। তাঁর নিজের আসার দরকার ছিল না। একজন কাউকে দিয়ে আমার খোঁজ নেওয়ালেই আমি আনন্দিত হতাম। তাঁর কাছ থেকে ১০ হাজার ডলারের চেকটি নিতে আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমি এখনো নিজের খরচ নিজে চালাতে পারছি। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থ যারা অর্থকষ্টে আছে তাদের জন্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমার অস্বস্তি দেখে শাওন বলল, তুমি চেকটা হাতে নাও। এখানে আছে তোমার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং দেশের মানুষের দোয়া। আমি সঙ্গে সঙ্গে অতি বিনয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে চেক গ্রহণ করলাম।

পাদটীকা:

প্রধানমন্ত্রী চলে গেছেন। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ। আমার পুত্র নিষাদ বলল, আমি উনার উপর ‘লাগ’ করেছি। (সে ‘র’ বলতে পারে না, লাগ করেছি অর্থ হলো রাগ করেছি)

আমি বললাম, কার ওপর রাগ করেছ? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর?

হুঁ।

কেন, বলো তো?

উনি আমার জন্য কোনো খেলনা আনে নাই।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। সবাইকেই তুষ্ট রাখতে হয়। সেই সবার মধ্যে পাগল এবং শিশুরাও আছে।

বাতেনি চিকিৎসক আব্দুস সোবাহান

হুমায়ূন আহমেদ

সাইনবোর্ডে লেখা, 'এইডস, ক্যান্সারসহ যাবতীয় রোগ-ব্যাধি গেরেন্টিসহ চিকিৎসা করা হয়। প্যাকেজ ডিল, বিফলে মূল্য ফেরত। গালে চড়।'

মগবাজারে যাবার পথে গাড়ি থেকে কয়েকবার এই সাইনবোর্ড চোখে পড়েছে। 'গালে চড়' লেখা পড়ে মজা পেয়েছি কিন্তু কখনো এইডস-ক্যান্সারের চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা হয় নি। ঢাকা শহরভর্তি এই ধরনের ধন্বন্তরি চিকিৎসক। তাদের বেশির ভাগই ডাবল গোল্ডমেডালিস্ট এবং গ্যারান্টিসহ ক্যান্সারের মতো দুরন্ত ব্যাধি আরোগ্য করে থাকেন।

এই ধরনের চিকিৎসকদের নিয়ে একটি গল্প লিখব বলে কয়েক বছর ধরেই ভাবছি। লেখা হয় নি। কারণ তাদের কারোর সঙ্গেই আমার দেখা হয় নি। তাদের সঙ্গে পরিচয় সাইনবোর্ডের মাধ্যমে।

গত ঈদে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়লাম লেখা নিয়ে। বেশ কিছু লেখা লিখতে হবে, বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু হিমু আর মিসির আলি লিখলে চলবে না, এর বাইরেও কিছু লিখতে হবে। হঠাৎ মনে হলো, ধন্বন্তরি সাইনবোর্ড চিকিৎসক নিয়ে একটা বড় গল্প লেখা যেতে পারে।

বাংলাদেশে প্রকাশিত অনেক পত্রিকার ঈদের আবদার মিটাতে পারি। ঈদ এলেই পত্রিকা সম্পাদক সস্তা জনপ্রিয় লেখকদের লেখার জন্য মহাব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঈদের ঝামেলা শেষ হলে তাদের পত্রিকাতেই সস্তা বাজারি লেখকরা সাহিত্যের কী ক্ষতি করছেন তা বেশ আয়োজন করেই লেখা। অন্য বাজারি লেখকদের বিষয়ে আমি জানি না, নিজের কথা বলতে পারি_ আমি এই ধরনের লেখা পড়ে কি জানি কেন, যথেষ্ট মজা পাই।

নুহাশপল্লীর ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে বিফলে মূল্য ফেরত, গালে চড় চিকিৎসকের কাছে এক সন্ধ্যাবেলায় উপস্থিত হলাম।

দুই কামরার অফিস। একটিতে চিকিৎসকের অ্যাসিস্ট্যান্ট বসে আছেন। অন্যটিতে চিকিৎসক। মাঝখানে ট্রান্সলুসেন্ট গগ্লাসের দরজা। এই ধরনের গগ্লাসের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না, নড়াচড়া চোখে পড়ে।

আমি গেছি গল্পের সন্ধানে, আমাকে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। চিকিৎসকের অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখে অবাক হলাম, মধ্যবয়স্ক হিজাব পরা একজন মহিলা কুস্তিগীর। বিশাল শরীর, গাবদা গাবদা হাত। সাহিত্যের ভাষায় সমীহ জাগানিয়া দেহ।

মহিলা বললেন, নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। রোগী কে?

আমি ম্যানেজারকে দেখিয়ে দিলাম। মহিলা ম্যানেজারের দিকে এক পাতার ফরম এগিয়ে দিলেন। ফরম ফিলাপ করতে হবে। আমি ফরমে চোখ বুলালাম। গল্প লেখার জন্য ফরমের একটা নমুনা আমার প্রয়োজন। ফরমটা এ রকম_

রেজিস্ট্রেশন নং :

(অফিস পূরণ করিবে)

নাম : (পূর্ণ নাম)

ঠিকানা : (মোবাইল নংসহ)

বয়স :

ওজন :

উচ্চতা :

গাত্র বর্ণ : (ফর্সা/শ্যামলা/কৃষ্ণ)

(টিক মার্ক দিন)

পছন্দের স্বাদ : মিষ্টি/তিতা/টক

(টিক মার্ক দিন)

ধূমপান : হ্যাঁ/না

(টিক মার্ক দিন)

পানে জর্দা : হ্যাঁ/না

(টিক মার্ক দিন)

পছন্দের আবহাওয়া : শীত/উষ্ণ

(টিক মার্ক দিন)

পছন্দের খাবার : মাছ/মাংস/সবজি

(টিক মার্ক দিন)

ব্যাধির চিকিৎসায় গাত্র বর্ণ লাগছে, পছন্দের খাবার লাগছে, পছন্দের আবহাওয়া লাগছে দেখে মনে হচ্ছে চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথি।

আমার বাবা এক সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছুদিনের জন্য ঝুঁকেছিলেন। তিনি মাত্র বারোটা ওষুধে চিকিৎসা করতেন। প্রায়ই আমাদের জিভে এক ফোঁটা ওষুধ দিতেন এবং সাগুদানার মতো (মিষ্টি) চার-পাঁচটা করে বড়ি খেতে হতো। বারো ওষুধের এই চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথির এক উপশাখা। নাম খুব সম্ভব বায়োকেমিক চিকিৎসা। এই চিকিৎসা শাস্ত্রের জনকের নাম_ 'সুসলার'।

ম্যানেজার চিন্তিত মুখে ফরম ফিলাপ করছে। জরুরি কোনো ফরম (যেমন আমেরিকান ভিসা বা ডিভি ফরম) ফিলাপ করার সময় চেহারা যেমন হয়, তার চেহারা সে রকম।

মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমি আপনার নাটক দেখেছি।

আমি মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। পত্রপত্রিকা, টেলিভিশনের কারণে নিজেকে আড়াল করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা সময় ছিল যখন কেউ আমাকে চিনে ফেললে ভালো লাগত। আগ্রহ, আনন্দ (কিছু অহঙ্কার) নিয়ে আলাপ করতাম। এখন অসহ্য লাগে।

মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, ডাক্তার সাহেব ধ্যানে বসেছেন। একটু দেরি হবে। এই ফাঁকে এক কাপ চা খান স্যার।

আমি অবাক হয়ে বললাম, উনি ধ্যান করেন নাকি?

জি। অনেক সংবাদ তিনি ধ্যানের মাধ্যমে পান।

কী ধরনের সংবাদ?

এই যেমন আপনারা এসেছেন, আপনাদের কার কী রোগ উনি ধ্যানের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন।

আমি বললাম, ভালো তো। বর্তমানের চিকিৎসকরা নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে রোগ নির্ণয় করেন। ধ্যান লাইনে চিকিৎসার কথা তেমন শোনা যায় না।

আমাকে রঙ চা দেওয়া হয়েছে। লেবুর গন্ধ, চা পাতার গন্ধ মিলে চা-টা খেতে ভালো হয়েছে। শুধু ভালো বললে কম বলা হয়। যথেষ্টই ভালো।

ম্যানেজারের ফরম ফিলাপ শেষ হয়েছে। মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট বলল, রেজিস্ট্রেশন ফি দিন। নাম রেজিস্ট্রি হবে। সব তথ্য কম্পিউটারে চলে যাবে। বিশ বছর পরে এলেও সব তথ্য পাবেন।

এই প্রথম লক্ষ করলাম, মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্টের সাইড টেবিলে একটা ল্যাপটপ আছে। যে চিকিৎসক ধ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন, তিনি আবার ল্যাপটপও ব্যবহার করেন দেখে আনন্দ পেলাম।

ম্যানেজার বলল, রেজিস্ট্রেশন ফি কত?

মহিলা বললেন, নরম্যাল এক শ' টাকা, সেমি আর্জেন্ট দুই শ' টাকা, আর্জেন্ট পাঁচ শ' টাকা।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, পাঁচ শ' টাকা দিয়ে দাও। আর্জেন্টই ভালো।

মহিলা ল্যাপটপে টিপাটিপি করতে করতে আমাকে বললেন, স্যার আপনার নাটকে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকে। এটা ঠিক না।

আমি বললাম, অবশ্যই ঠিক না।

আপনার একটা নাটক চ্যানেল আই-এ প্রায়ই দেখায়। নাটকটা ভুলে ভর্তি। এটার প্রচার বন্ধ হওয়া দরকার।

আমি বললাম, কোন নাটক?

নাটকের নাম 'পাপ'। সেখানে একজন পাকিস্তানি সোলজার পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে। ভুল পাঞ্জাবি।

আমি বললাম, আপনি পাঞ্জাবি জানেন?

মহিলা বলল, আমি জানি না তবে যিনি আমাকে ভুলের কথা বলেছেন তিনি পাঞ্জাবি জানেন। অনেকদিন পাঞ্জাবে ছিলেন।

নাটক নিয়ে হয়তো আরও আলোচনা হতো তার আগেই চিকিৎসকের ঘরে আমাদের ডাক পড়ল। মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, স্যার, আপনারা জুতা এই ঘরে রেখে খালি পায়ে ঢুকবেন। উনার ঘরে জুতা পায়ে ঢোকা নিষেধ।

আমরা খালি পায়ে ঘরে ঢুকলাম। এখন চিকিৎসকের বর্ণনা দেই। চেহারা অনেকখানি আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহম লিংকনের মতো। দাড়ি কেটে ফেলার পর। গাল ভাঙা। নাক থেকে ঠোঁটের দূরত্ব অনেকখানি। মাথার সব

চুল এবং ভুরু পাকা। বয়স নিশ্চয়ই ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। তাঁর গা থেকে পাকা তেঁতুলের টক গন্ধ আসছে। টক গন্ধি মানুষ আমি জীবনে প্রথম দেখলাম।

ঘরে চেয়ার-টেবিল নেই, কার্পেট পাতা। কার্পেটের ওপর শাদা রঙের একটা উলের আসনে চিকিৎসক পদ্মাসনের ভঙিতে বসা। তার পরনে শাদা লুঙ্গি, শাদা ফতুয়া। কাঁধে সিল্কের একটা উড়নির মতো ঝুলছে। উড়নির রঙও শাদা। চিকিৎসক এই উড়নি দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর নাক-মুখ চেপে ধরেছেন। কেন এটা করছেন তা বুঝা যাচ্ছে না।

চিকিৎসক চাপা গলায় বললেন, ধ্যানের মাধ্যমে পেয়েছি আপনারা ক্যান্সার ব্যাধির তদবিরে এসেছেন। ঠিক আছে?

ম্যানেজার আমার দিকে তাকাল। আমরা কোনো ব্যাধির তদবিরেই আসি নি। গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ডের সন্ধানে এসেছি। যাই হোক, আমি বললাম, জি জনাব। আপনার অনুমান সঠিক।

চিকিৎসক নাক-মুখ থেকে সাদা উড়নি নামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আপনাদের চিনেছি। আপনার নাম মোঃ হুমায়ূন কবীর। ঠিক হয়েছে?

পুরোপুরি ঠিক বলা চলে না। আমার নামের আগে মোহাম্মদ নেই, শেষেও কবীর নেই। তার পরেও ঝামেলা এড়ানোর জন্য বললাম, জি। এইবারও আপনার অনুমান সঠিক।

চিকিৎসক বললেন, আপনি নাটক লেখেন, নাটকে অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকে। আমি অবশ্যি দেখি না। আমার মেয়ে আমাকে বলেছে। মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে। সে-ই আমার অ্যাসিস্টেন্ট।

আমি বললাম, ভালো তো।

চিকিৎসক বললেন, চিকিৎসা শুরু করার আগে ক্যান্সার ব্যাধি বিষয়ে জানা দরকার। আপনারা কি জানেন?

আমি বললাম, কিছুটা জানি। সাধারণ জীবকোষ যখন মিউটেট করে তখনই ব্যাধির শুরু।

চিকিৎসক বললেন, আপনি যা জানেন তা হলো জাহেরি জানা। এই জ্ঞানে কিছু সত্য আছে তবে মূল সত্য নাই। মূল সত্য আছে বাতেনি জ্ঞানে। বাতেনি হলো অপ্রকাশ্য। বাতেনি জ্ঞান, অপ্রকাশ্য জ্ঞান। বুঝলেন?

আমি এবং ম্যানেজার দু'জনই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

চিকিৎসক উড়নি দিয়ে নাক ঘষতে ঘষতে বললেন, বাতেনি জ্ঞান বলে ক্যান্সার ব্যাধির সৃষ্টিকর্তা হলো খারাপ ধরনের কিছু জ্বিন। এরা জ্বিন সমাজেও অভিশপ্ত বলে মানুষের শরীরের ভেতর লুকিয়ে থাকে। কেউ লিভারে বসে থাকে, কেউ ফুসফুসে বসে থাকে। আমাদের সবার শরীরে এ রকম একাধিক জ্বিন বাস করে।

ম্যানেজার আঁতকে উঠে বলল, বলেন কী হুজুর!

চিকিৎসক বিরক্ত গলায় বললেন, আমাকে হুজুর বলবেন না। আমি হুজুর না। আমার গালভর্তি দাড়ি নাই, মাথায় পাগড়িও নাই। আমি চিকিৎসক।

ম্যানেজার বলল, সরি।

চিকিৎসক বললেন, সরি হবার কিছু নাই। অনেকেই এই ভুল করে। যাই হোক যে কথা বলছিলাম, দুষ্ট এই জ্বিন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বসে থাকলেও আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। যখন এই সব পুরুষ জ্বিনের সঙ্গে মেয়ে জ্বিন শরীরে ঢুকে তখনই সমস্যা।

আমি বললাম, কী রকম সমস্যা?

চিকিৎসক বললেন, মনে করেন একটা দুষ্ট জ্বিন আপনার ফুসফুসে বাস করে। একা একা থাকে। হঠাৎ সেখানে একটা মেয়ে জ্বিন এসে গেল। তখন তারা ঘর বানিয়ে সংসার পাতে। জাহেরি জ্ঞানে এই ঘরকেই বলে টিউমার। পুরুষ এবং নারী জ্বিন একসময় সন্তান সৃষ্টি করতে থাকে। সন্তানরা হয় অনেক। ঘরে তাদের জায়গা হয় না। তারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আলাদা বাসা বানায়। জাহেরি জ্ঞানে একে বলে মেটাসটেসিস। বুঝলেন?

আমি বললাম, বুঝার চেষ্টা করছি।

চিকিৎসক বললেন, আপনার শরীরে দুষ্ট জ্বিন তার সঙ্গিনী পেয়েছে, তারা ঘর বানানো শুরু করেছে তবে এখনো সন্তান উৎপাদন শুরু করে নাই।

আমি একবার ভাবলাম বলি, রোগী আমি না। আমার ম্যানেজার। তার নামই রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তারপর ভাবলাম কথা বাড়িয়ে লাভ কী। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আজই প্রথম দেখা, আজই শেষ। আমার প্রয়োজন গল্প। গল্প পেয়ে গেছি।

চিকিৎসক বললেন, আমার প্রধান কাজ হবে জ্বিন-দম্পতির সন্তান উৎপাদন বন্ধ করা।

আমি বললাম, জ্বিনের ফ্যামিলি প্ল্যানিং করাবেন? চিকিৎসক আহত গলায় বললেন, আপনি লেখক মানুষ বলেই বাতেনি কিছু কথা আপনাকে বললাম, এই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবেন না। আপনি আগামী সোমবার থেকে রোজ সন্ধ্যায় আসবেন চিকিৎসা শুরু হবে। মেয়ে জ্বিনটাকে তাড়ালেই হবে।

আমি বললাম, আপনার অশেষ মেহেরবানি।

গল্প কি এখানে শেষ হয়?

শেষ হয় না। কিছু বাকি থাকে। সেই বাকিটা কী তা ধরতে পারছি, কিন্তু লেখায় আনতে পারছি না বলে ঈদসংখ্যায় কোনো পত্রিকাতেই এই গল্প ছাপা হল না।

ঈদের লেখালেখির ক্লান্তি দূর করতে বেড়াতে গেলাম সিঙ্গাপুর। মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে হার্টের রুটিন চেকআপ করতে গিয়ে ধরা পড়ল ক্যান্সার। সেই ক্যান্সারও নাকি থেমে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে শরীরে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় মেটাসথিসিস।

বাতেনি চিকিৎসকের ভাষায় জ্বিনের সন্তান-সন্ততিরা ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি আধুনিক মানুষ। ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য পৃথিবীর সেরা আমেরিকার ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র মোমেরিয়েলস্লোন ক্যাটারিং-এ নাম লেখালাম।

আমার আমেরিকান চিকিৎসক পৃথিবীর সেরা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের একজন।

তিনি জাহেরি অর্থাৎ জাগতিক চিকিৎসক।

আরেকজন আছেন বাতেনি চিকিৎসক। তাঁর নাম আব্দুস সোবাহান। ইনি চিকিৎসা করেন ধ্যানের মাধ্যমে।

আমি যতবার আমার অনকলজিস্টের সঙ্গে কথা বলি, ততবারই পরোক্ষভাবে বাতেনি চিকিৎসকও উপস্থিত থাকেন।

একবার আমি ড. স্টিফান ভিচকে (ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, আমার চিকিৎসক।) বললাম, ক্যান্সার বিষয়ে আমরা কি সবকিছু জানি?

ডাক্তার ভিচ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, না।

আমি বললাম, আমাদের শরীরের সাধারণ কোষের মতো ক্যান্সার কোষও যে জীবন্ত তা জানি। আচ্ছা এমন কী হতে পারে যে এদের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে? এরা আলাদা একা প্রাণ!

ডাক্তার ভিচ ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এদের ভাব-ভঙ্গি সে রকমই।

কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো ডা. ভিচের চেহারাটা বাতেনি চিকিৎসক আব্দুস সোবাহানের মতো হয়ে গেল।

তোমার চারপাশে যা ঘটছে সবসময় তার ব্যাখ্যা চাইবে না। সব ব্যাখ্যা যার কাছে আছে তিনি কখনো তা প্রকাশ করেন না। তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখেন বলে সব ব্যাখ্যা লুকানো।

প্রাচীন চৈনিক দার্শনিক_ 'লি সুন'।

বন্ধুবিদায়

হুমায়ূন আহমেদ

৩৭ বছরের পুরোনো বন্ধু, সুখ ও দুঃখদিনের সঙ্গীকে বিদায় জানিয়েছি। আমাদের বন্ধুত্বকে কেউ সহজভাবে নেয়নি। পারিবারিকভাবে তাকে কুৎসিত অপমান করা হয়েছে। তার পরও বন্ধু আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমেরিকায় এসে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হলো। হায় রে আমেরিকা! বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন, আমি সিগারেট-বন্ধুর কথা বলছি। ৩৭ বছরের সম্পর্ক এক কথায় কীভাবে বাতিল হলো, তা বলার আগে জীবনের প্রথম সিগারেট টানার গল্পটা করা যেতে পারে।

চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি। আমাদের বাসা স্কুলের পাশেই, নালাপাড়ায়। একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, বাবা তাঁর সিগারেটের প্যাকেট ভুলে ফেলে গেছেন। প্যাকেটে তিনটা সিগারেট। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্যাকেটটি প্যান্টের পকেটে ভরে ফেললাম। রান্নাঘর থেকে দেশলাই নিলাম। স্কুলে গেলাম উত্তেজিত অবস্থায়। ভয়ংকর কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার আনন্দে তখন শরীর কাঁপছে।

আমি সিগারেট ধরালাম স্কুলের বাথরুমে। সেটা কখন—ক্লাস চলার সময়ে, নাকি টিফিন পিরিয়ডে—তা মনে করতে পারছি না। সস্তা স্টার সিগারেটের (এর চেয়ে দামি সিগারেট কেনার সামর্থ্য বাবার ছিল না) কঠিন ধোঁয়ায় বালকের কচি ফুসফুস আক্রান্ত হলো। আমি বিকট শব্দে কাশছি। হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে গেল। বাথরুমের দরজা উত্তেজনার কারণেই বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। স্যারদের বাথরুম ছাত্রদের বাথরুমের সঙ্গেই। বাইরে থেকে তালা লাগানো থাকে। স্যাররা চাবি নিয়ে আসেন। বড়ুয়া স্যার কুক্ষণে এসে আসামির কানে ধরে হেডস্যারের রুমে নিয়ে গেলেন।

হেডস্যার অবাক হয়ে বললেন, তুই এই বয়সে সিগারেটের প্যাকেট পকেটে নিয়ে ঘুরিস? তোকে স্কুল থেকে টিসি দেব। কাল তোর বাবাকে নিয়ে আসবি।

আমি বললাম, জি, আচ্ছা।

হেডস্যার বললেন, তোর বাবাকে আনার দরকার নেই। তোকে আজই টিসি দিয়ে দিচ্ছি। যন্ত্রণা পুষে লাভ নেই।

বড়ুয়া স্যার (আমাদের ক্লাসটিচার। অতি বিচিত্র কারণে তাঁর ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রকে সন্তানের অধিক স্নেহ করতেন।) বললেন, থাক, মাফ করে দেন। ছেলের বাবা এই ঘটনা জানলে ছেলেকে মারধর করবেন। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। এমন শাস্তি দেব, জীবনে সিগারেট ধরবে না। প্রয়োজনে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে সারা গায়ে ছ্যাঁকা দিব।

বড়ুয়া স্যার কঠিন শাস্তিই দিলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাবা রে, বিড়ি-সিগারেট খুব খারাপ জিনিস। আর কোনো দিন খাবি না।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, খাব না, স্যার। কোনো দিন খাব না।

বড়ুয়া স্যার আরও একবার আমার মহাবিপদে আমাকে উদ্ধার করতে অনেক দেনদরবার করেছিলেন। কাঠপেন্সিল-এর কোনো লেখায় বিস্তারিত বলেছি। আবারও বলি।

আমি ছিলাম মহা দুষ্টু। পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক বালক। কাজেই ক্লাস সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষায় আমি একা ফেল করলাম। তখনকার স্কুলের নিয়মে ক্লাস সিক্স থেকে সব ছেলে নতুন ক্লাসে গেল। আমি একা বসে রইলাম। ক্লাসে আমি আর বড়ুয়া স্যার। ফেল করার সংবাদ বাসায় কীভাবে দেব, এই আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁদছি। বাবা কিছু বলবেন না আমি জানি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে তাঁর পুত্র-কন্যাদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাকুক, ধমকও দেননি। কিন্তু মা অন্য জিনিস। তিনি মেরে তক্তা বানিয়ে দেবেন।

বড়ুয়া স্যার কিছুক্ষণ আমার কান্না দেখে বললেন, আয় আমার সঙ্গে। হেডস্যারকে বলে-কয়ে দেখি বিশেষ বিবেচনায় কিছু করা যায় কি না।

হেডস্যার বড়ুয়া স্যারের ওপর অত্যন্ত রাগ করলেন। তিনি কঠিন গলায় বললেন, যে ছেলে ড্রয়িং ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে ফেল করেছে, আপনি তার জন্য সুপারিশ করতে এসেছেন? এই ছেলেকে আমি তো স্কুলেই রাখব না।

বড়ুয়া স্যার বললেন, স্যার, এই ছেলেটাকে পাস করিয়ে দিন। আমি আর কোনো দিন আপনার কাছে কোনো সুপারিশ নিয়ে আসব না।

বিশেষ বিবেচনায় হেডস্যার আমাকে ক্লাস সেভেনে প্রমোশন দিলেন।

পুরোনো দিনের কথা থাকুক, এখনকার কথা বলি।

স্লোয়ান কেটারিংয়ের ডাক্তাররা জানতে চাইলেন, আমি সিগারেট খাই কি না।

আমি লজ্জিত মুখে বললাম, হ্যাঁ।

দিনে কয়টা?

আমি মিনমিন করে বললাম, ত্রিশটা।

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথের আমার হার্টের চিকিৎসক ফিলিপকো আমি এখনো ত্রিশটা সিগারেট দিনে খাই শুনে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন আমি মানুষ না, জন্তুবিশেষ।

ঢাকায় আমার বন্ধু এবং হার্টের চিকিৎসক ডা. বরেন আমার সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ শুনে আনন্দিত গলায় বলেছিলেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি তো মারা যাবেন! (ডা. বরেন কারও আগাম মৃত্যুসংবাদ কেন জানি খুব আনন্দের সঙ্গে দেন।)

স্লোয়ান কেটারিংয়ের ডাক্তার আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে কিছুই বললেন না। আমি খানিকটা কনফিউজড হয়ে গেলাম। তবে কেমোথেরাপি শুরুর আগের দিন আমাকে হাসপাতালে ডাকা হলো। তারা বলল, আমার চামড়া কেটে তার ভেতর একটি নিকোটিন রিলিজিং যন্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। শরীর যখন নিকোটিনের জন্য কাতর হবে, তখন যন্ত্র নিকোটিন রিলিজ করবে। খুব ধীরে ধীরে নিকোটিনের পরিমাণ যন্ত্র কমাবে।

আমি বললাম, শরীরের ভেতর আমি যন্ত্র ঢোকাব না। সিগারেট ছেড়ে দিলাম।

তারা বলল, যে দিনে ত্রিশটা সিগারেট খায়, সে সিগারেট ছাড়তে পারবে না।

আমি বললাম, পারব।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পেরেছি।

আমাদের বাড়ির সামনে একটি ডেইলি গ্রোসারি শপ আছে। সেখানে চা-কফি পাওয়া যায়। যখন কাউকে দেখি কফির মগ নিয়ে বাইরে এসে সিগারেট ধরিয়ে টানছে, তখন এত ভালো লাগে! মনে হয়, তারা কী সুখেই না আছে!

যারা সিগারেট ছেড়ে দেয়, তারা অতি দ্রুত সিগারেটবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যেমন আমার বন্ধু প্রতীক প্রকাশনার মালিক, একসময়ের গল্পকার আলমগীর রহমান। সে একসময় দিনে দুই প্যাকেট সিগারেট খেত। সিগারেট ছাড়ার পর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন আমরা সিগারেট না, কাগজে মুড়ে গুয়ের পুরিয়া খাচ্ছি।

আমার ক্ষেত্রে কখনো এ রকম হবে না। পরিচিত কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে আমি তার পিঠে হাত রেখে বলব, আরাম করে খাও! আমি দেখি।

সিগারেট প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা গল্প বলি। একবার নিউইয়র্কে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে উঠেছি (প্যান অ্যাম হোটেল)। দেখি, তিনি সিগারেট খাচ্ছেন না, চুরুট টানছেন। আমি বললাম, সিগারেট বাদ দিয়ে চুরুট কেন?

উনি বিরক্ত গলায় কী একটা মহিলা কলেজের নাম করে বললেন, ছাত্রীরা এই সমস্যা করেছে। সভার মাঝখানে দল বেঁধে মঞ্চে এসে বলেছে, ‘আপনাকে সিগারেট ছাড়তে হবে। মঞ্চেই কথা দিতে হবে।’ আমি বাধ্য হয়ে সিগারেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে চুরুট ধরেছি।

আরও কিছুদিন অতিরিক্ত বেঁচে থাকার জন্য মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করে। মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ কী? গলিত স্থবির ব্যাঙও নাকি দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে। অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

আমি কখনো অতিরিক্ত কিছুদিন বাঁচার জন্য সিগারেটের আনন্দ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ভেবে রেখেছিলাম ডাক্তারকে বলব, আমি একজন লেখক। নিকোটিনের বিষে আমার শরীরের প্রতিটি কোষ অভ্যস্ত। তোমরা আমার চিকিৎসা করো, কিন্তু আমি সিগারেট ছাড়ব না।

তাহলে কেন ছাড়লাম?

পুত্র নিনিত হামাগুড়ি থেকে হাঁটা শিখেছে। বিষয়টা পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। দু-এক পা হেঁটেই ধুম করে পড়ে যায়। ব্যথা পেয়ে কাঁদে।

একদিন বসে আছি। টিভিতে খবর দেখছি। হঠাৎ চোখ গেল নিনিতের দিকে। সে হামাগুড়ি পজিশন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার ছোট্ট শরীর টলমল করছে। যেকোনো সময় পড়ে যাবে এমন অবস্থা। আমি ডান হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে হাঁটা বাদ দিয়ে দৌড়ে হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বজয়ের ভঙ্গিতে হাসল। তখনই মনে হলো, এই ছেলেটির সঙ্গে আরও কিছুদিন আমার থাকা উচিত। সিগারেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত সেই মুহূর্তেই নিয়ে নিলাম।

পাদটীকা

আমেরিকার মহান লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন, অনেকেই বলে সিগারেট ছাড়া কঠিন ব্যাপার। আমি তাদের কথা শুনেই অবাক হই। সিগারেট ছাড়া কঠিন কিছুই না। আমি ১৫৭ বার সিগারেট ছেড়েছি।

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

ব্ল্যাক ফ্রাইডে

হুমায়ূন আহমেদ

শুক্রবার মুসলমানদের জন্য পবিত্র একটি দিন। খ্রিষ্টানদের রোববার, ইহুদিদের শনিবার। সপ্তাহের তিন দিন, তিন ধর্মাবলম্বীরা নিয়ে বসে আছে। শুক্রবার মুসলমানদের পবিত্র দিন বলেই কি আমেরিকানরা 'কালো শুক্রবার' আবিষ্কার করল? থ্যাংকস গিভিংয়ের রাত থেকেই শুরু এই কালো শুক্রবার। একটি দিনের জন্য কম দামে জিনিসপত্র বিক্রির মহোৎসব। ৪০ ইঞ্চি রঙিন টেলিভিশন, যার দাম এক হাজার ডলার, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, কালো শুক্রবারে তা বিক্রি হয় ২০০ ডলারে। আমেরিকানরা বড় বড় দোকানের সামনে প্রচণ্ড শীত অগ্রাহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। কখন রাত ১০টা বাজবে, কখন শুরু হবে কালো শুক্রবার?

গত বছরের কালো শুক্রবারে দোকানে ঢোকার ধাক্কাধাক্কিতেই নাকি মারা গেছে পাঁচজন। 'সেল' শুনলেই আমেরিকানদের মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। জীবন বাজি রেখে হলেও 'সেলে' জিনিস কিনতে হবে। সেই জিনিস কাজে লাগুক বা না লাগুক। আমেরিকা পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে অকারণ শপিং করে দেউলিয়া হওয়া যায়। ব্যাংক বাড়িঘর নিয়ে নেয়। এমনও হয়, গৃহত্যাগীরা পথে হাঁটাহাঁটি শুরু করে। টিভির খবরে দেখলাম, এই ব্ল্যাক

ফ্রাইডেতে সারা আমেরিকায় ৫৫ বিলিয়ন ডলারের জিনিসপত্র বিক্রি হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এ বছরের বাংলাদেশের বাজেটের দ্বিগুণ এক ব্ল্যাক ফ্রাইডের বিক্রি।

এ বছরের কালো শুক্রবারটা আমার দেখার শখ ছিল। শরীরে কুলোয়নি বলে যাওয়া হয়নি। একটি লাভ অবশ্যি হয়েছে, টেলিফোনে আমার এক প্রিয় কবির সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁর প্রথম কথা, ‘হুমায়ূন! তোমার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি কেন?’

কবির কণ্ঠস্বর তেজি। গলা শুনে বোঝার উপায় নেই, উনি শারীরিকভাবে অচল হয়ে গেছেন। খুব মন খারাপ হলো যখন উনি বললেন, হুমায়ূন! আমার জীবন হুইলচেয়ারে আটকে গেছে।

আমি এক মিনিটের বেশি হুইলচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে পারি না। আমার কিডনি নষ্ট। ছয় বছর বেঁচে আছি ডায়ালাইসিসের ওপর। ডায়ালাইসিস নিয়ে পাঁচ বছরের বেশি কেউ বাঁচে না। আমি এক বছর বেশি বেঁচে আছি। সেটাই বা খারাপ কী? হুমায়ূন! বয়সে আমি বড় বলে তোমাকে তুমি করে বলছি। সমস্যা আছে?

আমি বললাম, আপনার ক্ষেত্রে নেই।

কবির নাম শহীদ কাদরী।

‘রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের
সাঁজোয়া বাহিনী,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার,
কারফিউ, ১৪৪ ধারা,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে ধাবমান খাকি
জিপের পেছনে মন্ত্রীর কালো গাড়ি,

কাঠগড়া গরাদের সারি সারি খোপ

কাতারে কাতারে রাজবন্দী’

(রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট লেফট; শহীদ কাদরী)

আমি কবিকে বললাম, আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু আপনার অনেক গল্প আমি জানি।

কবি বললেন, কী গল্প জানো?

আমি বললাম, আপনি একদিন দুর্বল এক কবির বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছেন। দুর্বল কবির বিশাল বাড়ি দেখে বিস্মিত হয়ে হিন্দিতে বললেন, ‘এতনা ছোটা কবি কা এতনা বড় মোকাম!’

কবি হো হো করে হেসে ফেলে বললেন, হুমায়ূন, একদিনের কথা বলি। আমি শামসুর রাহমানকে নিয়ে বের হয়েছি। কারও পকেটেই টাকা-পয়সা নেই। রাস্তার পাশের দোকান থেকে দুই কাপ চা কিনে চুমুক দিচ্ছি, হঠাৎ দেখি, কালো মরিস মাইনর গাড়িতে করে বিখ্যাত লোকসংগীতশিল্পী যাচ্ছেন। শামসুর রাহমান বলেছিলেন, ‘দেখো, আমরা দুই প্রধান কবি রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছি, রিকশায় ওঠার সামর্থ্যও নেই, আর একজন ফোক সিঙ্গার গাড়িতে চড়ে ঘুরছে। কোনো মানে হয়?’

আসাদুজ্জামান নূর এই কবির সঙ্গে চাকরি করতেন। মনে হয় সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্যকেন্দ্রে চাকরি। শহীদ কাদরী ছিলেন নূরের বস। নূরের কাছে শুনেছি, একদিন কবি অফিসে এসে ফাইলপত্র ছুড়ে ফেলে বললেন, হিন্দি চুলের চাকরি শহীদ কাদরী করে না। বলেই যে বের হলেন, আর কোনো দিন অফিসে ফিরলেন না।

এই মুহূর্তে দেশের একজন প্রধান কবি পড়ে আছেন নিউইয়র্কের জ্যামাইকায়। কোনো মানে হয়? তিনি কি তাঁর দেশের অপূর্ব জোছনা দেখবেন না? তাঁর গায়ে কি বর্ষার প্রথম জলধারা পড়বে না? তিনি কি আর কোনো দিনও হাতে নেবেন না বাংলাদেশের বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল?

‘ভয় নেই

আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে সেনাবাহিনী

গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে

মার্চপাস্ট করে চলে যাবে

এবং স্যালুট করবে তোমাকে প্রিয়তমা!

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করব

কত বাঙ্কার ডিঙিয়ে

কাঁটাতার, ব্যারিকেড পার হয়ে অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে

আর্মিদের কারগুলি এসে দাঁড়াবে

ভায়োলিন বোঝাই করে

কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা’

(তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা; শহীদ কাদরী।)

কবি! আপনাকে অভিবাদন!

পাদটীকা

হুমায়ূন! আমি নাস্তিক মানুষ। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রার্থনায় বিশ্বাস করা শুরু করেছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমেরিকার সব হাসপাতালে রোগীদের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে। স্ট্যাটিসটিকসে দেখা গেছে, যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়, তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

আমি আমার স্ত্রীকে আপনার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছি।

শহীদ কাদরী

ব্ল্যাক ফ্রাইডে ২০১১

জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক

পুনশ্চ

দুর্বল কবি এবং ফোক সিঙ্গারের নাম আমার লেখায় ছিল। শহীদ কাদরীর অনুরোধে দুটি নাম বাদ রাখলাম।

পাঠকদের কাছে ধাঁধা—নাম দুটি কী? সঠিক উত্তরদাতার কাছে প্রথম আলোর এক কপি ডাকযোগে পৌঁছে যাবে।

শাদা গাড়ি

হুমায়ূন আহমেদ

আমি যাদের পছন্দ করি না তাদের সঙ্গেই আমার ঘুরেফিরে দেখা হয়। হয়তো খুব জমিয়ে গল্প করছি_ কাজের ছেলেটি এসে বলল, 'কে জানি আইছে, আপনারে বুলায়।' বাইরে উঁকি দিলে এমন একজনকে দেখা যাবে যার সঙ্গে একসময় খাতির ছিল। এখন নেই। তবু হাসির একটা ভাব করে উল্লাসের সঙ্গে বলতে হবে, আরে-আরে কী খবর? তারপর কেমন চলছে? এক সময় হয়তো এই লোকটির সঙ্গে তুই-তোকারি করতাম। এখন দূরত্ব রাখার জন্য ভাববাচ্যে কথা বলতে হয়। বাংলাভাষার ভাববাচ্য খুব উন্নত নয়। দীর্ঘসময় কথা চালানো যায় না।

আজকের ব্যাপারটাই ধরা যাক। আড্ডা জমে উঠেছে। বাংলা বানান নিয়ে খুব তর্ক বেধে গেছে। এমন সময় কাজের ছেলেটি এসে বলল, আমাকে কে নাকি ডাকছে। বেরিয়ে দেখি সাবি্বর। আমি হাসিমুখেই বললাম_ বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন। সে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

আসুন ভেতরে।

না, না ঠিক আছে।

আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। গল্পগুজব হচ্ছে। আসুন পরিচয় করিয়ে দেই।

অন্য আরেকদিন আসব।

আজ অসুবিধা কিসের? আসুন ভেতরে।

সাবি্বর চোখ-মুখ লাল করে ভেতরে ঢুকল। পুরুষ মানুষদের লজ্জায় এমন লাল হতে কখনো দেখিনি। নাকের পাতায় বিন্দু বিন্দু ঘাম।

ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা। আজিজ ফজলুকে জিজ্ঞেস করছে, 'ধূলি বানান কর দেখি? হ্রস্বউকার না দীর্ঘউকার?' রাগের চোটে ফজলু তোতলাচ্ছে। ক্রমাগত তার মুখ দিয়ে থুতু পড়ছে। বিশ্রী অবস্থা।

সাবি্বর নার্ভাস ভঙ্গিতে রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং মৃদুস্বরে বলল, 'আজ যাই, অন্য আরেক দিন আসব।'

বসুন না। তাস হবে। তাস খেলতে পারেন তো?

জি-না। আজ আমি যাই। আজ আমার একটা কাজ আছে।

আমি সাবি্বরকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। সেখানে শাদা রঙের প্রকাণ্ড একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুশকো জোয়ান এক ড্রাইভার সাবি্বরকে দেখে স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে বের হলো এবং দ্রুত দরজা খুলে মূর্তির মতো হয়ে গেল। আমাদের বয়সী একটা ছেলের জন্য এতটা আয়োজন আছে ভাবাই যায় না। আমি তীব্র একটা ঈর্ষা নিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। ছুটির সকালে ঈর্ষার মতো জিনিস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটা অনেকক্ষণ ধরে বুকে খচখচ করতে লাগল।

সাবি্বরের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা এরকম_ পুরানা পল্টনের এক ওষুধের দোকানে ঢুকেছি প্যারাসিটামল কিনতে। পয়সা দিয়ে বেরুবার সময় দেখলাম ঘটাঘট শব্দে সব দেকানের ঝাপ পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। কী হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারছে না। সবাই ছুটছে। ট্রাকওলাদের সঙ্গে বাসওলাদের কী নাকি একটা ঝামেলা। একদল লোক নাকি রামদা নিয়ে বের হয়েছে। ব্যাপারটা গুজব হবারই কথা। এ যুগে রামদা নিয়ে কেউ বের হয় না। তবে সাবধানের মার নেই। দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে দেখি গলির মাথায় একটা পাঞ্জাবি গায়ে দারুণ ফর্সা ছেলে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে। তবে চশমা ছিটকে পড়েছে অনেকটা দূরে। আমি গিয়ে তাকে টেনে তুললাম। সে বিড়বিড় করে বলল, 'চশমা ছাড়া আমি কিছু দেখতে পাই না। আমার মায়োপিয়া, চোখের পাওয়ার সিক্স ডাইওপটার।' চশমার একটা কাচ খুলে পড়ে গিয়েছিল। এক কাচের চশমা পড়ে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাকে বাড়ি না-পৌঁছানো পর্যন্ত সে আমার বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখল। সম্ভবত ভয় পাচ্ছিল, আমি তাকে ফেলে রেখে চলে যাব।

কোনো পুরুষ মানুষের এমন মেয়েদের মতো চেহারা হয় আমার জানা ছিল না। পাতলা ঠোঁট। কাচবিহীন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কাজল পরানো। কিশোরীদের মতো ছোট্ট চিবুক। আমি বললাম, আপনি কী করেন?

ইংরেজিতে এমএ পরীক্ষা দেব।

তাই নাকি? ভালো।

গত বৎসর পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। দেইনি। আমার হার্টের অসুখ, হার্টবিটের রিদমে গণ্ডগোল আছে।

চিকিৎসা করছেন তো?

এর কোনো চিকিৎসা নেই।

এই বলেই সে ফ্যাকাশেভাবে হাসতে লাগল। আমি সিগারেট বের করলাম, নেন, সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। নিকোটিন হার্টের মাসলে ক্ষতি করে। ফাইবারগুলি শক্ত করে দেয়।

এতসব জানলেন কীভাবে?

আমার মা ডাক্তার।

নিউ ইস্কাটনের যে বাড়ির সামনে রিকশা থামল সেটাকে বাড়ি বলা ঠিক না। সেটা এক হুলস্থুল ব্যাপার। আমরা রিকশা থেকে নামতেই চারদিকে ছোটাছুটি পড়ে গেল। সাব্বিরের মতো দেখতে একজন মহিলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, কেন তুমি কাউকে কিছু না বলে বেরুলে? আর বেরুলেই যখন কেন গাড়ি নিলে না?

সাব্বির অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। ভদ্রমহিলা অভিমানী স্বরে বললেন, কেন তুমি আমাদের কষ্ট দাও?

আর যাব না মা।

তোমার দুর্বল হার্ট। যে-কোনো সময় কিছু-একটা যদি হয়ে যেত। তখন?

মা আর যাব না।

এ ছেলেটাই সাব্বির।

রাত ৮টার আগে আমি এদের বাড়ি থেকে বেরুতে পারলাম না। সাব্বিরের বাবা এবং মা এমন একটা ভাব করতে লাগলেন যেন আমি সাব্বিরকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। এরকম বড় একটা কাজের যোগ্য পুরস্কার দিতে না পেরে তারা দুজনেই অস্থির।

আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং বাড়ি চিনে আসবার জন্য একজন লোক চলল আমার সঙ্গে। ছোট গলিতে বড় গাড়ি ঢুকবে না_ এইজন্য টেলিফোন করে একটা ছোট গাড়ি আনানো হলো।

সাব্বির মা-বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমাকে এগিয়ে দিতে এলো গেট পর্যন্ত। নিচু স্বরে বলল, বাবা-মা আমার জন্য খুব ব্যস্ত। একটামাত্র ছেলে তো।

আপনি একাই নাকি?

জি। পাঁচ ভাইবোন ছিলাম আমরা। এখন আমি একা আছি।

বাকিরা কোথায়?

সবাই মারা গেছে। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ বেশিদিন বাঁচে না। আমার এক চাচা ছিলেন। তারও চার ছেলেমেয়ে ছিল। সবই ত্রিশ হবার আগেই মারা গেছে।

বলেন কী!

জি। আমিও বাঁচব না।

আরে, এসব কী বলছেন?

জি, সত্যি কথাই বলছি। দেখেন না হার্টের অসুখ হয়ে গেল।

আমার বন্ধুবান্ধবরা সব আমার মতো। পাস করবার পর সবাই কিছু-একটাতে ঢুকে পড়েছে। ব্যাংক, ট্র্যাভেল এজেন্সি, নাইট কলেজের পার্টটাইম টিচার। একমাত্র আজিজ কোথাও কিছু না পেয়ে ল'তে ভর্তি হয়েছে। ছুটিছাটার দিনে তাসটাস খেলি। মাঝে-মধ্যে পরিমলদের মামার বাড়িতে ভিসিআর দেখি এবং প্রায় সবদিনই আড্ডাটা শেষ হয় একটা ঝগড়ার মধ্যে। কোনো কোনো সময় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। তাতে অসুবিধা হয় না কিছু। আবার যখন দেখা হয় পুরনো কথা আর মনে থাকে না। বিয়ে করার আগ পর্যন্ত এই সময়টা বেশ ভালো। চায়ের দোকানে বসে বিস্বাদ চায়ে চুমুক দেয়ামাত্র মনে হয় জীবনটা বড়ই সুখের। ফজলুদের ভাড়াটেদের ছোট মেয়ের হৃদয়হীনতা আমাদের ফজলুর চেয়েও বেশি আহত করে।

এরকম সুখের সময় উপদ্রবের মতো মাঝে-মধ্যে উপস্থিত হয় সাব্বির। তাদের গাড়ির মুশকো ড্রাইভার চায়ের দোকান থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়।

সাব্বির লজ্জায় লাল হয়ে বলে, চা খাচ্ছিলেন সবাই মিলে?

হু আড্ডা দিচ্ছি, আসুন না।

জি-না, আমি চা খাই না।

চা না-খেলে খাবেন, বসে গল্প করুন।

আরেকদিন আসব। আজ একটা কাজ আছে।

কাজ থাকলে চলে গেলেই হয়। তা না। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বিরক্তিতে আমার গা জ্বলে যায়, তবু ভদ্রতা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কী নিয়ে এত গল্প করেন?

গল্প করার টপিকের অভাব আছে নাকি? রাজনীতি, মেয়েমানুষ, সিনেমা, প্রেম। এসে শুনুন না। শুনতে না চাইলে বলুন।

কী বলব?

প্রেমের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।

সাবি্বর টমেটোর মতো লাল হয়ে বলল, মেয়েদের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে সামনাসামনি বসে কথা বলি নি।

বলেন কী!

জি সত্যি। আমি একাই থাকি। মেয়েদের সঙ্গে মেশা আমার মা পছন্দ করেন না। আমার হার্টের অসুখ।

তাতে কী?

মানে ইয়ে-সামান্যতম একসাইটমেন্টে রিদমে গণ্ডগোল হয়। মেজর প্রবলেম হতে পারে।

আমি ঝামেলামুক্ত হবার জন্য বলি, আজ তাহলে যান। রোদ লাগছে। সাবি্বর তবু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। তার একটু দূরে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুশকো ড্রাইভার। কুৎসিত ব্যাপার।

মেয়েলি চেহারার এই যুবকের সুখ-দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখের কোনো মিল নেই। এর সঙ্গে নরম স্বরে মিষ্টি কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আমি সাবি্বরকে এড়িয়ে চলবার জন্য নানারকম কৌশল করি। ঘরে বসে থেকে কাজের ছেলেটিকে বলে পাঠাই_ বাসায় নেই। কখন ফিরবে তারো ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন নিজেই গিয়ে বলি, আমি এক্ষুনি বেরুব। হাসপাতালে এক বন্ধুকে দেখতে যাবার কথা। আজ তো কথা বলতে পারছি না।

আসুন, হাসপাতালে পৌঁছে দেই। কোন্ হাসপাতাল?

না না, তার কোনো দরকার নেই।

আমার কোনো অসুবিধা হবে না, আসুন না।

মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। রাস্তায় কোনো শাদা রঙের গাড়ি দেখলেই মনে হয়_

এই বুঝি গাড়ি থামিয়ে ফর্সা পাঞ্জাবি-পরা সাবি্বর বেরিয়ে আসবে। মোটা কাচের আড়ালে যার চোখ ঢাকা বলে মনের ভাব বোঝা যাবে না। কথা বলবে এমন ভালো মানুষের মতো যে রাগ করা যাবে না, আবার সহ্যও করা যাবে না।

রাস্তায় বেরুলেই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি লেগে থাকে। এই বুঝি দেখা হলো! অস্বস্তিটা সবচে বেশি হয় নীলু সঙ্গে থাকলে। নীলু তার কারণ বুঝতে পারে না। সে বিরক্ত হয়ে বলে, এরকম কর কেন? দেখা হলে কী হবে? আমার তো ভদ্রলোককে দেখতেই ইচ্ছা করছে।

একদিন অবিশ্যি দেখা হলো। গ্রিন রোড দিয়ে হেঁটে-হেঁটে আসছি। হঠাৎ রাস্তার পাশে শাদা গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে সাব্বির অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি না-দেখার ভান করলাম। এবং অতি দ্রুত একটা রিকশা ঠিক করে নীলুকে নিয়ে উঠে পড়লাম। সারাক্ষণই ভয় করতে লাগল এক্ষুনি হয়তো সে গাড়ি নিয়ে সামনে এসে থামবে। লাজুক গলায় বলবে_ কোথায় যাবেন বলুন, নামিয়ে দি। সেরকম কিছু ঘটল না। নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, হুট করে রিকশা নিলে কেন? আমি কতবার বলেছি পাশাপাশি রিকশায় চড়তে আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না কেন?

হুড তুলতে হয়। হুড তুললেই আমার কেন জানি দম বন্ধ হয়ে আসে।

হুড না তুললেই হয়।

পাগল, হুড না তুলে অবিবাহিত একটা ছেলের সঙ্গে আমি রিকশায় চড়ব!

বিকালটা আমার চমৎকার কাটল। দুজনে খুব ঘুরলাম। সন্ধ্যাবেলা ঢুকে পড়লাম একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। নীলু সারাক্ষণই বলল_ ইশ, বাসার সবাই দুশ্চিন্তা করছে। তবু উঠবার কোনো তাড়া দেখাল না।

নীলুকে শ্যামলীতে রেখে বাসায় ফিরে দেখি সাব্বির আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার?

কোনো ব্যাপার নয়, এমনি এলাম। দিনে এলে তো আপনাকে পাওয়া যায় না।

কোনো বিশেষ কাজে এসেছেন, না শুধু গল্প করবার জন্য?

না কোনো কাজে না, এমনি। সাব্বির রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। আমি বললাম, চা খান। চা দিতে বলি?

জি না, চা-টা না। আমি এখন যাব। মা চিন্তা করছেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে কখনো থাকি না।

আজই বা থাকলেন কেন?

আপনাদের দুজনকে আজ দেখলাম। বড় ভালো লাগল। সেইটা বলবার জন্যে।

সাব্বির লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

আমাকে আর নীলুকে দেখেছেন বুঝি?

জি। বড় ভালো লাগল। আমি একবার ভাবলাম এগিয়ে গিয়ে বলি_ কোথায় যাবেন চলুন পেঁৗছে দেই। আপনারা কী মনে করেন এই ভেবে গেলাম না।

আমি নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালাম। সাবি্বর মৃদুস্বরে বলল, আমি অবিশ্যি আপনাদের পেছনে-পেছনে গিয়েছি।

তাই নাকি?

জি, ড্রাইভারকে বললাম, দূর থেকে ঐ রিকশাটাকে ফলো করো।

তারপর ফলো করলেন?

জি। শাহবাগ পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভার আর রিকশাটা লোকেট করতে পারল না। আপনি কি রাগ করছেন?

না।

আমি একবার ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না। কিন্তু আপনাদের দুজনকে এত সুন্দর লাগছিল। কী সুখী-সুখী লাগছিল। আমার মনে হলো এটা বলা উচিত। আপনি রাগ করেন নি তো?

আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, না রাগ করি নি। রাত অনেক হয়ে গেছে এখন বাসায় যান। নয়তো আপনার মা আবার রাগ করবেন।

জি তা ঠিক।

সাবি্বর চলে গেল কিন্তু আমার বিরক্তির সীমা রইল না। লোকটি কী নির্বোধ না অন্যকিছু? আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ হলো। এরকম ঘটনা আবার ঘটবে, ও যদি আমাকে এবং নীলুকে আবার কখনো দেখে তাহলে আবারো তার শাদা গাড়ি আসবে পেছনে পেছনে। কী অসহ্য অবস্থা।

ঘটলও তাই। দিন সাতেক পর সাবি্বর এসে হাসিমুখে বলল, আপনারা কি বুধবার বিকালে শিশু পার্কের সামনে ফুচকা খাচ্ছিলেন?

মনে নেই।

আপনার পরনে ছিল একটা চেক চেক শার্ট আর আপনার বান্ধবীর গায়ে লাল রঙের চাদর। হাতে একটা চটের ব্যাগ, মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, পড়েছে।

আমি কিন্তু ফুচকা খাবার পর থেকে ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় এক ঘণ্টা আপনাদের ফলো করেছি।

তাই নাকি?

জি।

এত ভালো লাগছিল আমার। ড্রাইভারকে বললাম তারা দেখতে পায় না এমনভাবে তাদের ফলো করো। আপনি অবিশ্যি একবার পেছনে তাকিয়েছেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারেন নি।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, নীলুর সঙ্গে থাকলে আমি একটু অন্যমনস্ক থাকি।

সাব্বির গভীর আগ্রহে বলল, আচ্ছা এলিফেন্ট রোডের ঐ দোকানটা থেকে কী কিনলেন আপনারা?

আমি তার জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, আসুন, আপনার সঙ্গে নীলুর পরিচয় করিয়ে দেই।

না না, তার কোনো দরকার নেই। আপনাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতেই আমার ভালো লাগে। কীরকম অদ্ভুত সুখী-সুখী চেহারা। জানেন আমি মাকে আপনাদের কথা বলেছি?

ভালো করেছেন।

আমি যে মাঝে-মাঝে আপনাদের পেছনে-পেছনে যাই আপনি রাগ করেন না তো?

আমি উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালাম। একটা শাদা গাড়ি সর্বত্র আমাদের অনুসরণ করছে এটা ভাবতেই মন শক্ত হয়ে যায়।

সাব্বির বসে আছে আমার সামনে। তার ফর্সা কিশোরীদের মতো মুখে উত্তেজনার ছাপ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ চকচক করছে। বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। সে অনেকখানি ঝুঁকে এসে বলল, পৃথিবীর মানুষ এত সুখী কেন বলুন তো?

সাব্বিরের সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা। আর কখনো সে আমার কাছে আসে নি। হয়তো শরীর খুব বেশি খারাপ। ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। কিংবা গিয়েছে বাইরে। কিংবা অন্যকিছু। গিয়ে খোঁজ নেবার মতো ইচ্ছা কখনো হয়নি।

সাব্বির আর কখনো আসে নি কিন্তু তার শাদা গাড়িটি ঠিকই অনুসরণ করেছে_ আমাদের। যখনই নীলু মজার একটা কিছু বলছে কিংবা যখনই আমার নীলুর হাত ধরতে ইচ্ছা হয়েছে তখনই বুঝতে পেরেছি বিশাল শাদা গাড়িটা আশেপাশে কোথাও আছে। এর হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

নীলুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি। যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছি সে নীলুর মতো নয়। কিন্তু তার জন্যেও আমি প্রচণ্ড ভালোবাসা অনুভব করি। বৃষ্টির রাতে যখন হঠাৎ বাতি চলে যায়, বাইরে হাওয়ায় মাতামাতি শুরু হয়, আমি গভীর আবেগে হাত রাখি তার গায়ে। তখনি মনে হয় কাছেই কোথাও শাদা গাড়িটি বৃষ্টিতে ভিজছে। চশমা পরা অসুস্থ যুবক ভুরু কুঁচকে ভাবছে, মানুষ এত সুখী কেন?

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

সুপার হিরো

হুমায়ূন আহমেদ

হিরো একটি পশ্চিমা কনসেপ্ট। এদের কমিক বইয়ে হিরো আছে (ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান, সুপারম্যান), বাস্তবেও আছে।

আমাদের তেমন কিছু নেই। মাঝেমধ্যে এক-আধজনকে পাওয়া যায়— ভাঙা রেললাইনের সামনে গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেন থামায়। অনেকের জীবন রক্ষা করে। আমরা কিছুদিন তাকে নিয়ে হইচই করে ব্যাক টু দ্যা প্যাভিলিয়ন। উল্টো ব্যাপারও আছে, পুরো ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়া।

পশ্চিমা একজন হিরোর গল্প দিয়ে আজকের লেখা শুরু করছি। তার নাম টেরি ফক্স। কানাডার এক যুবক। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ভয়াবহ ক্যানসার (osteosarcoma) তাকে আক্রমণ করল। তার একটি পা কেটে ফেলে দিতে হলো। টেরি ফক্স হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ভাবলেন, ক্যানসার গবেষণার জন্যে আরও অর্থ প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা করলেন, এক পা নিয়েই তিনি কানাডার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে ক্যানসারের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করবেন। আটলান্টিক সমুদ্রে পা ডুবিয়ে তিনি দৌড় শুরু করলেন। তত দিনে একটা নকল পা লাগানো হয়েছে। এক শ তেতাল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি নকল পায়ে দৌড়ালেন। ৩,৩৩১ মাইল অতিক্রম করে তাকে থামতে হলো। কারণ ক্যানসার তখন ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তিনি ক্যানসার রিসার্চের জন্যে রেখে গেলেন সংগ্রহ করা এক শ মিলিয়ন ডলার। এখন সংগ্রহ পাঁচ শ মিলিয়ন ছেড়ে গেছে।

ক্যানসার রিসার্চের অর্থ সংগ্রহের জন্যে বিশ্বজুড়েই টেরি ফক্স ম্যারাথন হয়। পঁচিশতম ম্যারাথনে পৃথিবীর তিন মিলিয়ন মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, বাংলাদেশেও এই ম্যারাথন হয়েছে।

ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণাকেন্দ্রের জন্যে আমরা অর্থ সংগ্রহে নামতে যাচ্ছি। আমাদের গুরু অবশ্যই টেরি ফক্স।

আমি টেকনাফে বঙ্গোপসাগরে পা ডুবিয়ে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যাব। আমার পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব না। কারণ শিশুপুত্র আমার দুই পা চেপে ধরে থাকবে। এরা পা চেপে ধরায় ওস্তাদ। আমি পরিবার ছাড়া এক দিনও একা থাকতে পারি না। আমার সঙ্গে আমার দুই শিশুপুত্র এবং তাদের মা থাকবে। আমরা প্রতীকী অর্থে মাঝে মাঝে দৌড়াব। বাকিটা গাড়িতে। এই আনন্দযাত্রায় সবাইকে আমন্ত্রণ।

ক্যানসার ইনস্টিটিউটের জন্যে আমি যে সাড়া পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে আমার মানবজীবন ধন্য। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অভিনেতা রহমত (নয় নম্বর বিপদ সংকেত) আমাকে জানিয়েছেন রাজশাহীতে তাঁর পাঁচ বিঘা জমি দিতে চান। যদি ক্যানসার ইনস্টিটিউট ঢাকায় হয় তাহলে তিনি তাঁর সঞ্চিত পাঁচ লাখ টাকা দিতে চান। এর বেশি তাঁর আর নেই। থাকলে তাও দিতেন।

নিউইয়র্কের বাঙালি ডাক্তার নাহরিন মামুন জানিয়েছেন ঢাকায় তাঁর জমি আছে। পুরোটাই তিনি ক্যানসার ইনস্টিটিউটকে দিয়ে দিতে চান। আমি যখন বলব তখন।

জেনেভা থেকে আনজু ফেরদৌসী জানিয়েছেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় ১০ হাজার ডলার শুরুতে দিতে চান। এক্ষুনি দিতে চান। পরে যদি কিছু খরচ হয়ে যায়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আমেরিকার প্রধান প্রধান হাসপাতালে বাংলাদেশের ডাক্তার সন্তানরা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে যাচ্ছেন।

পৃথিবীর সেরা অনকোলজিস্টের অনেকেই বাংলাদেশি। একজন অনকোলজিস্ট রথীন্দ্রনাথ বসু ওভারিয়ান ক্যানসারে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন।

এঁরা সবাই বাংলাদেশের ক্যানসার ইনস্টিটিউটের জন্যে যা করণীয় তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অনলাইনে দেখলাম, ২৫০ জন নিজেদের ভিক্ষুক ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁরা অর্থ সংগ্রহের জন্যে ভিক্ষার থালা নিয়ে পথে বের হবেন।

আর হিমুর দল তো হলুদ পাঞ্জাবি পরে তৈরি হয়েই আছে। তারা নাচুনি বুড়ি। ঢোলের বাদ্যের অপেক্ষা।

কনফুসিয়াসের বিখ্যাত বাণী সবাইকে মনে করিয়ে দেই। ‘আ জার্নি অব আ থাউজ্যান্ড মাইলস বিগিনস উইথ আ সিংগল স্টেপ’। আমরা কিন্তু প্রথম ‘স্টেপ’ নিয়ে নিয়েছি।

আল্লাহপাক বলেছেন, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে হিংসামুক্ত অবস্থায়।

আমাদের ক্যানসার হাসপাতালে একই অবস্থা। তবে হিংসা না, সবাইকে প্রবেশ করতে হবে রাজনীতিমুক্ত অবস্থায়। ডাক্তাররা আওয়ামী লীগ, বিএনপি করবেন, ইলেকশন হবে, মারামারি হবে—তা কখনো না।

পৃথিবীর কোথাও আমি ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের রাজনৈতিক দল করতে দেখিনি। এই অর্থহীন মূর্খামি বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। এই মূর্খদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ড. আহমদ শরীফ এবং অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অতি শ্রদ্ধেয় দুজন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাদা দলে

ইলেকশন করেছি। এখন নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়। মূর্খ মনে হয়। আমাদের ক্যানসার ইনস্টিটিউটে মূর্খদের প্রবেশাধিকার নেই।

বিশ্বমানের গবেষণা শুরুতেই আমাদের ইনস্টিটিউটের পক্ষে সম্ভব হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। তবে সারা বিশ্বের ক্যানসারের ওপর গবেষণার ফলাফল তারা ব্যবহার করতে পারবেন।

বিদেশি ডাক্তারদের প্রতি আমাদের এক ধরনের মোহ আছে। মোহভঙ্গের সময় এসেছে। বাংলাদেশের সেরা অনকোলজিস্টরা ইনস্টিটিউট চালাবেন। একটি আমেরিকান হাসপাতালে সর্বাধুনিক যেসব যন্ত্রপাতি থাকবে তার সবই থাকবে আমাদের ইনস্টিটিউটে। যন্ত্রপাতি দেখাশোনা এবং পরিচালনার জন্যে দক্ষ শক্তিশালী টিম থাকবে। বর্তমান চিকিৎসা অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর।

দামি যন্ত্রপাতি কেনার বাংলাদেশি স্টাইলে আমরা যাব না। কোনো টেন্ডার না। ইনস্টিটিউট ঠিক করবে তার কী যন্ত্র দরকার। তারা সরাসরি কিনবে।

বাংলাদেশি স্টাইল হলো—প্রথমে টেন্ডার ডাকা হবে। ক্ষমতাসীন দল এবং তাদের পোষা ছাত্র দল ঝাঁপিয়ে পড়বে। টেন্ডার হয়ে যাবে। এখন বিদেশ ভ্রমণ পালা। নানান টিম আলাদা আলাদাভাবে যন্ত্র কেনা এবং তার প্রয়োগ জানতে বিদেশ ভ্রমণ করবে। সবশেষে যাবেন মন্ত্রী মহোদয় (স্ত্রী এবং শ্যালিকাসহ)।

যন্ত্র কেনার পর সবার আগ্রহ শেষ হয়ে যাবে। চট্টগ্রাম বন্দরে যন্ত্র পড়ে থাকবে দিনের পর দিন। কেউ ছুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে না। ছুটানোর দায়িত্ব কার এই নিয়ে জটিলতা। যন্ত্র ছোটানোতে আর মালকড়ি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এক সময় যন্ত্র ছাড় করা হবে। যন্ত্র বসাতে লাগবে প্রায় এক বছর। তত দিনে যন্ত্র বেঁকে বসেছে। এটা একটা সুসংবাদ, কারণ যন্ত্র কেন কাজ করছে না এটা জানার জন্যে বেশ কিছু দল আবার বিদেশ সফর করবে। স্ত্রী-শ্যালিকাসহ মন্ত্রী মহোদয় আবারও যাবেন।

পাদটীকা

বাংলাদেশের একজন রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্যে আমেরিকায় এসেছেন। নিউইয়র্কের বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনি সেরা ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন। তাঁর রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং বিভাগীয় প্রধান রোগী দেখতে এসে বললেন, আপনার কী কী সমস্যা আমাকে বলবেন?

রোগী চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনি বাংলাদেশি নাকি?

হ্যাঁ। আমার বাড়ি চিটাগাং।

রোগী থমথমে গলায় বললেন, এত টাকা-পয়সা খরচ করে আমেরিকায় এসে আমি বাংলাদেশি ডাক্তারের চিকিৎসা নিব না। আমেরিকান ডাক্তার লাগবে। বাংলাদেশি দিয়ে চলবে না।

একটা ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছি, তখন পশ্চিমারা বাঁদরের চেয়ে সামান্য ওপরে অবস্থান করছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুরুটা আমরা করেছি। চৈনিক ও আরবদের অবস্থান আমাদের নিচে। পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের সার্জনরা প্লাস্টিক সার্জারি করতেন।

কর্কট রোগ (ক্যানসার) সম্পর্কে পাঁচ হাজার বছর আগের ভারতীয় চিকিৎসকেরা নিদান দিয়ে গেছেন। শূন্য এবং অসীম—এই দুই সংখ্যা আমাদের আবিষ্কার।

আমাদের সবার উচিত শৈশবের একটি কবিতা নতুন করে পড়া—

‘আমরা যদি না জাগি মা

কেমনে সকাল হবে?’

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

উবাস্তে ইয়ামা

হুমায়ূন আহমেদ

'উবাস্তে'র অর্থ ময়লা, ইংরেজিতে গারবেজ। 'ইয়ামা' শব্দের অর্থ পর্বত। জাপানি এই শব্দ দুটির অর্থ—যে পর্বতে ময়লা ফেলা হয়।

প্রাচীন জাপানের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে লালন-পালন করার সামর্থ্য ছিল না। একটা পর্যায়ে তারা পিঠে করে বাবা-মাকে নিয়ে পর্বতের খাদে ফেলে দিয়ে আসত। সবার কাছে এটাই ছিল স্বাভাবিক। পিঠে চড়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার হাতে গাছের একটি ছোট্ট ডাল থাকত। এই ডাল দিয়ে তারা পুত্রের গায়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিত। এই কাজটা তারা কেন করত, তা পরিষ্কার নয়। বলা হয়ে থাকে, এই কাজটি তারা করত, যেন পুত্র ফিরে যাওয়ার পথ ভুলে না যায়।

আজকের জাপান অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের তৃতীয় শক্তি। জাপানি ইয়েনের পাশে আমেরিকান ডলার দাঁড়াতেই পারছে না। কিন্তু উবাস্তে ইয়ামা এখনো জাপানে আছে। তবে এখন আর পাহাড়-পর্বতে জাপানিরা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে রেখে আসছে না। তারা ফেলে দিয়ে আসছে আধুনিক ওল্ড হোমে।

এই বৃদ্ধনিবাসের একটি গল্প নাসিরের কাছে শুনলাম। [ড. নাসির উদ্দিন জমাদার, পূর্ণ প্রফেসর, রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান।] বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে নাসির আমাকে দেখতে আমেরিকায় এসেছে। এখন আমার সঙ্গে বাস করছে। প্রতিদিন জাপানি রান্না রাঁধছে। অতি পুষ্টিকর এবং অতি অখাদ্য এসব খাবার খেতে আমাকে বাধ্য করছে।

যা-ই হোক, বৃদ্ধনিবাসের গল্পটা বলি। নাসির প্রথম যৌবনে ভলান্টিয়ার হিসেবে জাপানিদের বৃদ্ধনিবাসে কাজ করত। অথর্ব এসব মানুষকে গোসল করানো, খাওয়ানো ছিল তার কাজ।

একদিন নাসিরের উপস্থিতিতে এক বৃদ্ধা তাঁর তিন পুত্রকে খবর পাঠালেন। তাদের বললেন, বাবারা! আমার খুব শখ বৃদ্ধাশ্রমে মৃত্যু না হয়, তোমাদের কারও বাসায় আমার মৃত্যু হয়। আমার কাছে নগদ পাঁচ কোটি টাকা আছে (বাংলাদেশি হিসাবে বলা হলো)। তোমাদের মধ্যে যে আমাকে জীবনের শেষ কটি দিন রাখবে, তাকে আমি এই পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে যাব।

তিন পুত্রই কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বলল, মা, সম্ভব হবে না। বাসা ছোট। এখন তোমার অনেক সেবা দরকার। সেটা পারব না।

বৃদ্ধ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে।

আমরা অনেক ভালো আছি না? বাংলাদেশের হতদরিদ্র রিকশাওয়ালা তার রিকশার পেছনে লিখে রাখে 'মায়ের দোয়া'। বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করা শুধু যে আমাদের সংস্কৃতির অংশ, তা নয়, এটা বাধ্যতামূলক।

যৌথ পরিবার বাংলাদেশে এখন আর নেই। যৌথ পরিবার ভেঙে পড়েছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের এখন বিভিন্ন ছেলেমেয়ের বাসায় রুটিন করে থাকতে হয়। যে পুত্র বা কন্যার কাছে বৃদ্ধ পিতা বা মাতা থাকতে যান, সেই পুত্র বা কন্যা আকাশের চাঁদ হাতে পায় বলে আমার ধারণা।

ধর্মও পিতা-মাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য বিষয়ে অনুশাসন দিয়ে গেছে। অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি দিচ্ছি, 'শো গ্র্যাটিচ্যুড টু মি অ্যান্ড টু ইয়োর প্যারেন্টস।' (সূরা ৩১, আয়াত-১৪) আল্লাহপাক তাঁর নিজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরপরই বলেছেন পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা।

সূরা ১৭, আয়াত ২৩-এ বলা হয়েছে, 'ইয়োর লর্ড ডিক্রিড দ্যাট ইউ ওয়রশিপ নান বাট হিম, অ্যান্ড দ্যাট ইউ বি কাইন্ড টু প্যারেন্টস।' আমি কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলাম, আমার বয়স ৭০ হয়েছে। আমি অথর্ব, সংসারে অপ্রয়োজনীয়। আমার বড় পুত্র নুহাশ হুমায়ূন আমাকে পিঠে করে

নিয়ে যাচ্ছে উবাস্তে বেঙ্গালওয়ানে [যেহেতু বাংলাদেশে পর্বত নেই, ফেলে দিতে হবে সমুদ্রে। বঙ্গোপসাগরের জাপানি নাম বেঙ্গালওয়ান।] আমার হাতে ছোট্ট লাঠি। আমি লাঠি দিয়ে পুত্রের গায়ে মাঝেমধ্যে বাড়ি দিচ্ছি। কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর!!

জাপানের রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হয়েছে। এর মূল প্রবক্তা হলেন রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক কাসাহারা কিওশি। এই কাজে অধ্যাপক কাসাহারাকে কয়েকবার ঢাকায় আসতে হয়েছে।

প্রতিবারই তাঁর সঙ্গী ছিলেন রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক ড. নাসির উদ্দিন জমাদার। এই মানুষটির ধারণা, হুমায়ূন আহমেদ এমন একজন, যাকে অধ্যাপক কাসাহারা কিওশি খুবই পছন্দ করবেন। মূলত নাসিরের আগ্রহে আমি অধ্যাপক কাসাহারাকে ঢাকা ক্লাবে ডিনারে দাওয়াত করলাম। ডিনারের একটি পর্যায়ে কাসাহারা ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়ে ঘোষণা করলেন, হুমায়ূন আহমেদ তাঁর বন্ধু।

এরপর তাঁর সঙ্গে আরও দুবার আমার দেখা হলো। প্রতিবারই আমার রসিকতায় তাঁকে হো হো করে হাসতে দেখলাম। একবার তিনি গলা নিচু করে বললেন, বন্ধু, আমি খুব খারাপ অবস্থায় আছি। আমার মানিব্যাগের ওপর আমার কোনো কন্ট্রোল নেই। মানিব্যাগ জমা রাখতে হয় আমার স্ত্রীর কাছে। আমাকে আমার হাতখরচের টাকাও তার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হয়। তোমার কী অবস্থা আমাকে বলো।

যা-ই হোক, বন্ধু কাসাহারা ড. নাসির জমাদারের হাতে একটি খাম আমাকে পাঠিয়েছেন। নাসির খুবই লজ্জিত ভঙ্গিতে খামটা আমার হাতে দিয়ে বলল, আপনার বন্ধু কাসাহারা এই খামটি আপনাকে দিতে বলেছেন। আমি আপনার স্বভাব জানি। আমি ভয় পাচ্ছি, আপনি খামটি নেবেন

না। তাহলে আপনার বন্ধু মনে কষ্ট পাবেন। জাপানের নিয়ম হচ্ছে, বন্ধুর আনন্দে ও দুঃসময়ে তার পাশে দাঁড়ানো।

আমি খাম খুলে দেখি, সেখানে সাত হাজার আমেরিকান ডলার। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ছয় লাখ টাকা। অধ্যাপক কাসাহারা (যাঁর মানিব্যাগের ওপর কন্ট্রোল নেই) তাঁর বন্ধুর চিকি ৎ সার জন্য পাঠিয়েছেন।

উবাস্তে ইয়ামার দেশের একজন মানুষের এই আচরণ হিসাবে মেলে না।

‘পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।’
—জীবনানন্দ দাশ

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ

হুমায়ূন আহমেদ

বালিশ

আমার জন্ম-জেলা নেত্রকোনায় 'বালিশ' নামের একধরনের মিষ্টি পাওয়া যায়। আকৃতি বালিশের মতোই। এক বালিশ সাত-আটজনে মিলে খেতে হয়। নেত্রকোনা শহরের এক মিষ্টির দোকানে বসে আছি। ময়রা থালায় করে বালিশ এনে আমার সামনে রাখল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, একটু মুখে দেন, স্যার।

আমি বললাম, যে মিষ্টির নাম বালিশ, সেই মিষ্টি আমি খাই না। আমি লেখক মানুষ। আমার মধ্যে রুচিবোধ আছে। ময়রা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, স্যার, আপনি একটা নাম দিয়ে দেন। আমার দোকানে এর পর থেকে আমি বালিশ মিষ্টি এই নামে ডাকব।

পুত্র-কন্যার নাম রাখার জন্য, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম রাখার জন্য কেউ কেউ আমার কাছে আসে। এই প্রথম মিষ্টির নাম। আমি মাথা ঘামাচ্ছি সুন্দর কোনো নাম যদি পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের স্ত্রী লেডি কেনিংয়ের সম্মানে একটি মিষ্টি বানানো হয়েছিল, নাম 'লেডিকেনি'। লেডি কেনিং চলে গেছেন, কিন্তু লেডিকেনি ময়রাদের দোকানে রয়ে গেছে।

আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে বললাম, মিষ্টির নাম রাখুন 'বালক-পছন্দ'। বালকেরা মিষ্টির সাইজ দেখে খুশি হয় বলেই এই নাম।

ময়রা বলল, স্যার, নাম রাখলাম। এরপর কেউ আমার দোকানে বালিশ পাবে না। পাবে বালক-পছন্দ।

নেত্রকোনায় অনেক দিন যাই না, আসলেই এই নাম রাখা হয়েছে কি না, তা জানি না। মনে হয় না।

রাজনৈতিক নাম বদলানো সহজ, স্থায়ী নাম বদলানো কঠিন ব্যাপার। কোনো মিষ্টির নাম যদি থাকত 'বঙ্গবন্ধু-পছন্দ', তাহলে ক্ষমতা বদলের পরপর তার নাম হতো 'জিয়া-পছন্দ'। এটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতাম না। কারণ, এটাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ বালিশ নিয়ে এত কথা বলছি কেন?

কারণ আছে। গত তিন দিনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ঘুম ভাঙার পরপরই আমার মাথার নিচ থেকে শাওন বালিশ টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছে। রহস্যময় কর্মকাণ্ড। তবে মিসির আলির পক্ষে রহস্য ভেদ করা কঠিন কিছু না। আমি রহস্য ভেদ করলাম।

কেমোথেরাপির কারণে আমার মাথার সব চুল পড়ে যাচ্ছে। বালিশভর্তি চুল। শাওন আমাকে এই দৃশ্য দেখাতে চাচ্ছে না। শুনেছিলাম, আধুনিক কেমোর উন্নতি হয়েছে। এখন আর চুল পড়ে না। ঘটনা তা না। যা-ই হোক, মাথার চুল নিয়ে আমি চিন্তিত না। আমি চিন্তিত নতুন এক রিয়েলিটিতে ঢুকছি। আমার পিঠে সিল পড়েছে—'তুমি ক্যানসার নামের ব্যাধির চিকিৎসা নিচ্ছ'। কারও যক্ষ্মার চিকিৎসা শুরু হলে কেউ বুঝে না তার কী রোগ হয়েছে বা কী চিকিৎসা চলছে। ব্যতিক্রম ক্যানসারের কেমো। সে শরীরের ভেতরে এবং বাইরে দুই জায়গাতেই নিজেকে জানান দেবে।

চুল পড়ার ঘটনা কেন ঘটে, একটু বলে নিই। শরীরে যখন কেমোথেরাপিতে ভয়ংকর বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, সেই বিষ খুঁজে বেড়ায়

সেই সব কোষকে, যা দ্রুত বিভাজনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। ক্যানসার সেল দ্রুত বিভাজন সেল। কাজেই কেমো তাদের আক্রমণ করে। একই সঙ্গে চুলের গোড়ার কোষ এবং মুখের ভেতরের কোষও দ্রুত বিভাজমান কোষ।

কোনো অন্যায় না করেও এরা মারা পড়ে। চুল পড়ে যায়, মুখের ভেতর ঘায়ের মতো হয়।

আমার মুখগহ্বর এখনো ঠিক আছে, তবে চুল পড়ছে। শাওন বাজারে গেলেই এখন টুপি কিনে আনে। নানান ধরনের টুপি পরে আয়নার সামনে দাঁড়াই। নিজেকে অন্য রকম লাগে। অন্য কোনো বাস্তবতায় চলে যাই।

ইতালির মোনজা শহরে আইন করা হয়েছে, যেন কেউ গোলাকার কাচপাত্রে গোল্ডফিশ রাখতে না পারে। আইন প্রণেতারা ভাবছেন, গোলাকার কাচপাত্রে বাস করার কারণে গোল্ডফিশগুলোর দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে। পৃথিবী সম্পর্কে তারা ভুল ধারণা পাচ্ছে।

মজার ব্যাপার হলো, আমরা মানুষও প্রবল বিভ্রমে বাস করি। আমাদের সবার বাস্তবতাই আলাদা। মানুষ হিসেবে আমরা আলাদা। আমাদের রিয়েলিটিও আলাদা।

এখন নিউইয়র্কে রাত আটটা। আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসে আছি। বাংলাদেশে দিনে লিখতাম, এখন লিখছি রাতে। ভিন্ন বাস্তবতা না?

যা-ই হোক, এই মুহূর্তে আমার মন ভালো, জাপানি লেখক হারুকি মুরাকামির একগাদা বই টরন্টো থেকে সুমন রহমান মেইল করে পাঠিয়েছে। কিছুদিন হলো এই লেখকের বই আগ্রহ নিয়ে পড়ছি। কেন পড়ছি, তা পরে একসময় বিতং করে জানাব।

খোদ জাপানি ভাষায় আমার একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে। বই নিয়ে জাপান থেকে ড. নাসির জমাদার (তিনি বইটির অনুবাদক) নিউইয়র্কে আসছেন। এই খবরটিতেও আনন্দ পাচ্ছি। বইটির বাংলা নাম বনের রাজা। বাচ্চাদের একটি বই। শুভ্রকে নিয়ে লেখা কোনো বই জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হলে হারুকি মুরাকামিকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখতাম...। না থাক, কী লিখতাম, তা সবাইকে না জানালেও চলবে।

টরন্টোর সুমন বইগুলোর সঙ্গে এক লাইনের একটি চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে লেখা—'দ্রুত সুস্থ হয়ে পাঠকদের উৎকণ্ঠা দূর করুন'।

ভাই, সুমন। কোনো কিছুই আমার হাতে নেই। নিয়ন্ত্রণ অন্য কারোর কাছে।

পাদটীকা

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের দুটি ছেলে নিতান্ত অল্প বয়সে হোয়াইট হাউসে মারা যায়। আব্রাহাম লিংকন তারপর হতাশ হয়ে লিখলেন, গডের সৃষ্টি কোনো জিনিসকে বেশি ভালোবাসতে নেই। কারণ, তিনি কখন তাঁর সৃষ্টি মুছে ফেলবেন, তা তিনি জানেন। আমরা জানি না।

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ : সংসার

হুমায়ূন আহমেদ

একজন মানুষ এক জীবনে কতবার 'সংসার' করে? বেশির ভাগ মানুষের জন্য একবার। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশি মানুষের জন্য দুবার। প্রথম সংসার জ্বলেপুড়ে যাওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার। আমি, মনে হয়, কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। এখানে 'সংসার' মানে বিয়ে করে ঘর বাঁধা বোঝাচ্ছি না। হাঁড়িকুড়ি, বিছানা-বালিশ নিয়ে দিনযাপন বোঝাচ্ছি।

আমার মা অতি অল্প বয়সে বাবার সঙ্গে সংসার করতে এসেছিলেন। বাবার মৃত্যুতে মায়ের সংসার লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তিনি তাঁর বড় ছেলের সঙ্গে ঢাকায় এলেন। নিউমার্কেট থেকে হাঁড়িকুড়ি কিনে নতুন সংসার শুরু করলেন। আমি বাবাশূন্য মায়ের নতুন সংসারে যুক্ত হলাম।

পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় গেলাম। গুলতেকিনকে নিয়ে শুরু হলো তৃতীয় সংসার। হাঁড়িপাতিল কেনা, বিছানা-বালিশ কেনা।

ঢাকায় ফিরে এসেই সেই সংসারও ভাঙল। উত্তরার এক বাসায় শুরু হলো আমার একার চতুর্থ সংসার। বছর তিনেক পর শাওন আমার সঙ্গে যুক্ত হলো। 'দখিন হাওয়া'য় আমার পঞ্চম সংসার।

ক্যানসার বাধিয়ে আমেরিকায় এসে শুরু হলো ষষ্ঠ সংসার।

সম্ভবত, সপ্তম সংসার হবে আমার শেষ সংসার। সেখানে কি আমি একা থাকব, নাকি সুখ-দুঃখের সব সাথিই থাকবে?

দার্শনিক কথাবার্তা থাক, ষষ্ঠ সংসার নিয়ে বলি।

বাড়ি ভাড়া করা হলো, হাঁড়ি-পাতিল কেনা হলো; টিভি কেনা, বিছানা-বালিশ—সে এক হইচই।

তিন রুমের একটি আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি। বাড়িটা নিশ্চয় সুন্দর। কারণ, কথাবার্তার একপর্যায়ে বাড়িতে রোগী দেখতে আসা প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'বাড়িটা কার?'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'যেহেতু ভাড়া নিয়েছি, আপাতত আমার।'

বাড়িটায় তিনটা শোবার ঘর। জানালার পাশে প্রকাণ্ড মেপলগাছ। মেপলগাছের পাতায় ফল-এর (Fall) রং ধরতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে তাকালে চোখ ঘরে ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমেরিকান ইনডিপেনডেন্ট বাড়িতে 'এটিক' নামের একটা ছাদঘর থাকে। এই ঘরটা হয় সবচেয়ে সুন্দর। অনেকখানি সময় আমি এটিতে একা কাটাই। লেখালেখি করি না। ছবি আঁকি। জলরং ছবি। ছবি মোটেই ভালো হচ্ছে না। রঙে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। শুধু অন্যদিন-এর মাজহার বলছে, 'অসাধারণ! আপনার আঁকা ছবি বিক্রি করে আমরা চিকিৎসার খরচ তুলে ফেলতে পারব, ইনশাল্লাহ।'

চিকিৎসার খরচ নিয়ে আমি এই মুহূর্তে ভাবছি না। নিজেকে ব্যস্ত কীভাবে রাখা যায়, ভাবছি তা নিয়ে।

প্রচুর বই জোগাড় করেছি (অর্থাৎ, কিনেছি)। বাড়ির পাশেই একটা পাবলিক লাইব্রেরি, তার মেম্বার হয়েছি। মেম্বার হতে গিয়ে গোপন আনন্দও পেলাম। বিদেশি লেখকদের বইয়ের তাকে দেখি আমার অনেক বই। বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, ‘বাংলা ভাষার এই বই তোমরা কীভাবে পেয়েছ?’ লাইব্রেরিয়ান বলল, ‘আমাদের বই দেয় লাইব্রেরি অব কংগ্রেস।’

আমি বললাম, ‘বাংলা ভাষার এই লেখক আমার প্রিয় লেখকদের একজন।’ লাইব্রেরিয়ান বলল, ‘হাউ নাইস! তুমি তার একটা বই ইস্যু করে নিয়ে যাও। সাত দিন রাখতে পারবে।’

আমি হিমুর একটা বই ইস্যু করে নিয়ে এলাম।

দেশে যখন ছিলাম, নিয়মিত সাপ্তাহিক টাইম পড়তাম। এখন পয়সা দিয়ে চারটি পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি–

Time
Science
Scientific American
National Geographic

অন্য সময় হলে শাওন মাসে মাসে এতগুলো টাকা খরচ করতে দিত না। তার এখন হিসাবের টাকা। গুনে গুনে খরচ করতে হচ্ছে। সে ঠিক করেছে, আমার কোনো কিছুতেই বাধা দেবে না। বিশাল বাড়িতে আমাদের সঙ্গে মাজহার ছাড়া কেউ নেই। কাজেই জলি ও তার স্বামীকে নাইওর নিয়ে এসেছি। রান্নার দায়িত্ব জলি নিয়ে নিয়েছে। সে প্রতিদিন জিজ্ঞেস করে, ‘হুমায়ূন ভাই, আজ কী খাবেন?’ আমি চেষ্টা করি এমন কোনো খাবারের নাম করতে, যা জোগাড় করা অসম্ভব। কিন্তু অবাক কাণ্ড, খাবারের টেবিলে তা পাচ্ছি। উদাহরণ–

কচুর লতি দিয়ে কাঁঠালবিচি
গরুর ভুঁড়ি
মাছ দিয়ে মাষকলাইয়ের ডাল
ডাঁটা দিয়ে ট্যাংরা মাছ।

মাজহার দায়িত্ব নিয়েছে আমাকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর। অদ্ভুত, উদ্ভট ও অখাদ্য সব ফল ও ফলের রস আমাকে নিয়মিত খেতে হচ্ছে। অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের ফল খেয়ে আমি এখন বুঝেছি–জগতে ফলের রাজা আম। ফলের রানি আম। ফলের রাজপুত্র-রাজকন্যা আম।

দেশে আমি ‘গর্তজীবী’ ছিলাম। আমেরিকায় এসে গর্ত থেকে বের হয়েছি। যতটা পারি, পৃথিবী দেখে যাই। কিছুই তো বলা যাচ্ছে না।

গর্ত থেকে বের হয়ে আমি কিছুটা সময় আমার বাড়ির পেছনের ব্যাক ইয়ার্ডে (Back Yard) কাটাই। আমেরিকানরা এই জায়গাটা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। উইকএন্ডে বারবিকিউ করে, আড্ডা দেয়, বিয়ার খেয়ে উল্লাস করে। বাকি দিনগুলোতে জায়গাটা পড়ে থাকে অনাথের মতো। আমি চেষ্টা করি প্রতিদিন সন্ধ্যার কিছুটা সময় এখানে কাটাতে।

এক সন্ধ্যায় পুত্র নিষাদকে নিয়ে বসেছি। হঠাৎ পুত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ‘বাবা, দেখো, বাংলাদেশের চাঁদটা এখানে চলে এসেছে। আকাশে কত বড় চাঁদ!’ তাকিয়ে দেখি, মেপলগাছের ফাঁকে নিউইয়র্ক নগরে সম্পূর্ণ বেমানান এক চাঁদ নির্লজ্জের মতো উঠে বসে আছে। তার তো থাকার কথা বাঁশবাগানে মাথায়।

আমি পুত্রকে বললাম, ‘বাংলাদেশের চাঁদ এখানে কীভাবে চলে এসেছে?’ সে গম্ভীর গলায় বলল, ‘আমরা যখন প্লেনে করে এসেছি, তখন প্লেনের পেছনে পেছনে চলে এসেছে। চাঁদটা তোমাকে খুব ভালোবাসে তো, এই জন্য এসেছে।’

শিশুরা না বুঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে ফেলে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে আমার মনে হলো, আমার পুত্রের কথা সত্যি। বাংলাদেশের দুঃখী চাঁদ শুধু আমাকে ভালোবেসেই কংক্রিটের নিউইয়র্ক নগরে চলে এসেছে।

আমি আমার লেখকজীবনে একটিমাত্র উপন্যাসই আমেরিকায় বসে লিখেছিলাম–সবাই গেছে বনে। নামটা ধার করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান থেকে–‘আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে’।

আচ্ছা, পাঠক কি জানেন, এই গানটি কোনো আনন্দগীতি, না দুঃখগীতি? রবীন্দ্রনাথের অতি আদরের পুত্র শমির মৃত্যুর পরদিন রাতে আকাশ ভেঙে জোছনা নেমেছিল। রবীন্দ্রনাথ একা টানাবারান্দায় বসে প্রবল জোছনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লিখলেন–

‘আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে\
যাব না গো যাব না যে
রইনু পড়ে ঘরের মাঝে–
এই নিরালায় রব আপন কোণে।...
আমার এ ঘর বহু যতন ক’রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে
কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে...’

নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ – ০৪ : নো ফ্রি লাঞ্চ

হুমায়ূন আহমেদ

'নো ফ্রি লাঞ্চ'–একটি আমেরিকান বাক্য। এই বাক্যটা বলে তারা এক ধরনের শ্লাঘা অনুভব করে। তারা সবাইকে জানাতে পছন্দ করে যে তারা কাজের বিনিময়ে খাদ্যে বিশ্বাসী।
এই ধরনের বাক্য বাংলা ভাষাতেও আছে–'ফেলো কড়ি মাখো তেল'। গায়ে তেল মাখতে হলে কড়ি ফেলতে হবে। আরামের বিনিময়মূল্য লাগবে। যা-ই হোক, ফ্রি লাঞ্চে ফিরে যাই। নো ফ্রি লাঞ্চের দেশে চিকিৎসা করতে ব্যাগ ভর্তি ডলার নিয়ে যেতে হবে, এই তথ্য আমি জানি। তবে বিকল্প ব্যবস্থাও আছে। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা বলে যেকোনো হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হবে। বুকে ব্যথা মানে হার্ট অ্যাটাক। হাসপাতাল হেলথ ইনস্যুরেন্স আছে কি নেই তা না দেখেই রোগী ভর্তি করবে। চিকিৎসা শুরু হবে। চিকিৎসার একপর্যায়ে ধরা পড়বে রোগীর হয়েছে ক্যানসার। হাসপাতাল তখন ক্যানসারের চিকিৎসা শুরু করবে। রোগীকে ধাক্কা দিয়ে হাসপাতালের ফুটপাতে ফেলে দেবে না। চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর বলতে হবে, আমি কপর্দকশূন্য। এক মিলিয়ন ডলার বিল আমি দেব, তবে একসঙ্গে দিতে পারব না। ভেঙে ভেঙে দেব। প্রতি মাসে পাঁচ ডলার করে। এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া ছাড়া হাসপাতালের তখন আর করার কিছু থাকে না। বাংলাদেশিদের কাছে এই বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা সংগত কারণেই বেশ জনপ্রিয়।
বাঙালি ব্যবস্থায় আমি চিকিৎসা শুরু করব, এই প্রশ্নই ওঠে না। সমস্যা হচ্ছে, বিপুল অঙ্কের অর্থও তো আমার নেই।
আমার দুটো গাড়ি। দুটোই বিক্রির জন্য পাঠানো হলো। একটা বিক্রি হলো। দখিন হাওয়ার যে ফ্ল্যাটে থাকি, সেটা বিক্রির চেষ্টা করলাম। পারলাম না, ফ্ল্যাটবাড়ি নিয়ে কিছু আইনগত জটিলতা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে উত্তরায় পাঁচ কাঠার একটা জমি পেয়েছিলাম। সেই জমি বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। লাভ হলো না। বাকি থাকল নুহাশ পল্লী। অর্থ সংগ্রহের ছোটাছুটির একপর্যায়ে অন্যপ্রকাশের মাজহার বলল, আপনি কেন অস্থির হচ্ছেন? আমি তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আপনার চিকিৎসার অর্থ কীভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে তা দেখার দায়িত্ব আমার। আপনার না।
আমি বললাম, টাকা কীভাবে জোগাড় করবে? ভিক্ষাবৃত্তি? চাঁদা তুলবে?
মাজহার বলল, না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, কারও কাছ থেকে এক ডলার সাহায্য নেব না। এই মুহূর্তে আমার হাতে ৫০ হাজার আমেরিকান ডলার আছে।
আমি বললাম, দেখাও।
মাজহার বলল, দেখাতে পারব না। ৫০ হাজার ডলার নিউইয়র্কে আপনার জন্য আলাদা করা। চ্যানেল আইয়ের সাগর ভাই আপনার জন্য আলাদা করে রেখেছেন। সাহায্য না, ঋণ। পরে শোধ

দেবেন।
আমি খানিকটা ভরসা পেলাম। চ্যানেল আইয়ের সাগরের অনেক বদভ্যাসের (!) একটি হলো শিল্প-সাহিত্যের কেউ বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া। এই কাজ অতীতেও সে অনেকবার করেছে। এখনো করছে। ভবিষ্যতেও করবে কি না জানি না। ইতিমধ্যে তার উচিত শিক্ষা হয়ে যাওয়ার কথা।
আমেরিকায় অর্থ ব্যয়ের একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। হিসাবটা বাংলাদেশি টাকায় দিই। স্লোয়ান কেটারিং মেমোরিয়ালের ডাক্তাররা আমার কাগজপত্র দেখবেন। রোগ নিয়ে কথাবার্তা বলবেন। শুধু এই জন্য তিন লাখ টাকা জমা দিতে হলো।
ডাক্তার শরীরে মেডিপোর্ট বসানোর জন্য Radio ল্যাবে পাঠালেন। (মেডিপোর্টের মাধ্যমে কেমোথেরাপি শুরু হবে) মেডিপোর্ট বসানোর খরচ হিসেবে জমা দিতে হলো আট লাখ টাকা। মেডিপোর্ট বসানোর পরদিন কেমো শুরু হবে। আটটি কেমোর পুরো খরচ একসঙ্গে দিতে হবে। টাকার পরিমাণ এক কোটি টাকা। ভাগে ভাগে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।
শাওন ও মাজহার দুজনেরই দেখি মুখ শুকনো। নিশ্চয়ই কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। যেহেতু তারা আমাকে বলেছে, টাকা-পয়সার বিষয় নিয়ে আমি যেন চিন্তা না করি, আমি তাই চিন্তা করছি না।
কেমোথেরাপি দিতে এসেছি। কেমোথেরাপির ডাক পড়বে, ভেতরে যাব। ডাক পড়ছে না। একা বসে আছি। শাওন আমার সঙ্গে নেই। সে মাজহারের সঙ্গে ছোটাছুটি করছে। শাওন চোখ লাল করে কিছুক্ষণ পরপর আসছে, আবার চলে যাচ্ছে।
একটা পর্যায়ে শাওন ও মাজহার দুজনকে ডেকে বললাম, 'মার্ফিস ল' বলে একটি অদ্ভুত আইন আছে। মার্ফিস ল বলে—If any thing can go wrong, it will go wrong. আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা বলো। টাকা কম পড়েছে?
মাজহার বলল, হ্যাঁ। চ্যানেল আইয়ের টাকাটা এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালে আমরা অর্ধেক, অর্থাৎ ৫০ লাখ টাকা দিতে চাই, ওরা নেবে না। হাসপাতাল বলছে, পুরো টাকা নিয়ে আসো, তারপর চিকিৎসা শুরু হবে। আমি বললাম, চলো, ফিরে যাই। টাকা জোগাড় করে চিকিৎসার জন্য আসব।
শাওন বলল, তোমার চিকিৎসা আজই শুরু হবে। কীভাবে হবে আমি জানি না, কিন্তু আজই হবে। শাওন বাচ্চাদের মতো কাঁদতে শুরু করল। আমি বললাম, তুমি সবার সামনে কাঁদছ। বাথরুমে যাও। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে কাঁদো।
সে আমার সামনে থেকে উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার ডাক পড়ল, কেমোথেরাপি শুরু হবে। টাকা বাকি থাকতেই শুরু হবে।
সমস্যার সমাধান করলেন পূরবী দত্ত। তিনি হাসপাতালকে বোঝাতে সমর্থ হলেন যে হুমায়ূন আহমেদ নামের মানুষটি চিকিৎসা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ না। তিনি অবশ্যই প্রতিটি পাই-

পয়সা শোধ করবেন।

হাসপাতাল চিকিৎসার পুরো টাকা শুরুতেই কেন নিয়ে নেয় তা ব্যাখ্যা করি। অনেক রোগী একটি কেমোর টাকা জোগাড় করে কেমো নিয়ে হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়। সে বলে, আমার আর টাকা নেই বলে কেমো নিতে পারছি না। আমার চিকিৎসা অসম্পূর্ণ। আমেরিকান হাসপাতাল চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখতে পারে না।

পাদটীকা

সর্বাধুনিক, বিশ্বমানের একটি ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণাকেন্দ্র কি বাংলাদেশে হওয়া সম্ভব না? অতি বিত্তবান মানুষের অভাব তো বাংলাদেশে নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেন স্লোয়ান বা কেটারিং হবেন না? বিত্তবানদের মনে রাখা উচিত, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ব্যাংকে জমা রেখে তাঁদের একদিন শূন্য হাতেই চলে যেতে হবে। বাংলাদেশের কেউ তাঁদের নামও উচ্চারণ করবে না। অন্যদিকে আমেরিকার দুই ইঞ্জিনিয়ার স্লোয়ান ও কেটারিংয়ের নাম তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরেও আদর-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে স্মরণ করা হয়।

আমি কেন জানি আমেরিকায় আসার পর থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি, হতদরিদ্র বাংলাদেশ হবে এশিয়ায় ক্যানসার চিকিৎসার পীঠস্থান।

যদি বেঁচে দেশে ফিরি, আমি এই চেষ্টা শুরু করব। আমি হাত পাতব সাধারণ মানুষের কাছে।